যদ্যপি আমার গুরু

আহমদ ছফা

জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাককে চলমান বিশ্বকোষ বললে খুব একটা অত্যুক্তি করা হয় না। অর্থশাস্ত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, শিল্প-সাহিত্য, ধর্ম-সংস্কৃতি এই সবগুলো বিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞের মতো মতামত দেয়ার ক্ষমতা রাখেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সর্বজনবিদিত। সমকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপীঠসমূহের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের অনেকেই একবাক্যে তাঁর মেধা এবং ধী-শক্তির অনন্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন। এই নিভৃতচারী, অনাড়ম্বর জ্ঞানসাধক মানুষটি সারাজীবন কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি। সভা-সমিতিতে কথাবার্তা বলারও বিশেষ অভ্যাস তাঁর নেই। তথাপি এই কৃশকায় অকৃতদার মানুষটি তাঁর মেধা এবং মনন শক্তি দিয়ে জাতীয় জীবনের সন্ধিক্ষণ এবং সংকটময় মুহূর্তসমূহে পথ নির্দেশ করেছেন। অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক, বলতে গেলে, চারটি দশক ধরেই তরুণ বিদ্যার্থীদের অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছেন।

সকলেই স্বীকার করেন অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক একজন প্রবাদতুল্য পুরুষ। কিন্তু তাঁর জ্ঞানচর্চার পরিধি কতদূর বিস্তৃত, আর তিনি ব্যক্তি মানুষটি কেমন সে বিষয়েও মুষ্টিমেয় অনুরাগীদের বাইরে অধিক সংখ্যক মানুষের সম্যক ধারণা নেই। *যদ্যপি আমার গুরু* গ্রন্থটি পাঠক সাধারণের মনে অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের মনীষা এবং মানুষ আবদুর রাজ্জাক সম্পর্কে একটি ধারণা গঠন করতে অনেকখানি সাহায্য করবে।

এই গ্রন্থের লেখক আহমদ ছফা আমাদের সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তিনি অধ্যাপক রাজ্জাকের ছাত্র। দীর্ঘদিন মেলামেশা করার ফলে অধ্যাপক রাজ্জাককে খুব ঘনিষ্ঠভাবে দেখার যে দুর্লভ সুযোগ তাঁর হয়েছে, বর্তমান গ্রন্থ তার প্রমাণ। অধ্যাপক রাজ্জাকের ওপর খোলামেলা, তীক্ষ্ণ, গভীর এবং সরস এমন একটি গ্রন্থ রচনা করা একমাত্র আহমদ ছফার পক্ষেই সম্ভব। লেখক অধ্যাপক রাজ্জাকের উচ্চারিত বাক্যের শুধু প্রতিধ্বনি করেননি, ব্যাখ্যা করেছেন, উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করেছেন, প্রয়োজনে প্রতিবাদও করেছেন। এখানেই গ্রন্থটির আসল উৎকর্ষ। অধ্যাপক রাজ্জাক নিজের কথা বলতে গিয়ে তাঁর সময় সমাজ এবং সমকালীন বিশ্বের কথা বলেছেন। সামাজিক দলিল হিসেবেও গ্রন্থটির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

ISBN 984 410 022 4
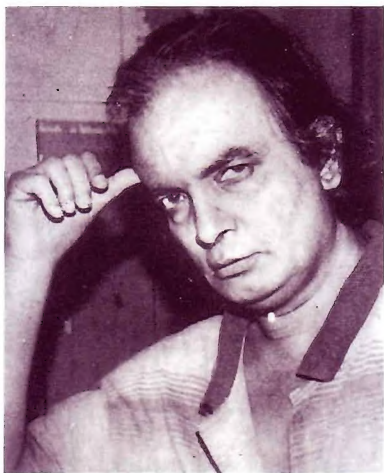
আহমদ ছফা
জন্ম : ১৯৪৩
গাছবাড়িয়া, চট্টগ্রাম

সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি শাখায় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, গান, প্রবন্ধ, অনুবাদ, ইতিহাস, ভ্রমণকাহিনী মিলিয়ে তিরিশটিরও অধিক গ্রন্থের প্রণেতা।

যদ্যপি আমার গুরু ■ আহমদ ছফা

যদ্যপি আমার গুরু

আহমদ ছফা

মাওলা ব্রাদার্স ॥ ঢাকা

প্রকাশনার পাঁচ দশকে
মাওলা ব্রাদার্স

তৃতীয় মুদ্রণ
মে ২০০০
দ্বিতীয় মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

প্রকাশক
আহমেদ মাহমুদুল হক
মাওলা ব্রাদার্স
৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ২৪৯৪৬৩

প্রচ্ছদ
কাইয়ূম চৌধুরী

কম্পোজ
বাংলাবাজার কম্পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড ৩য় তলা
ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
বসুন্ধরা প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স লিমিটেড
৫১/৫২ বনগ্রাম লেন, ঢাকা ১১০০

দাম
আশি টাকা মাত্র

ISBN 984 410 022 4

JADDAYPI AMAR GURU : Ahmed Sofa. Published By Ahmed Mahmudul Haque of Mowla Brothers 39 Banglabazar, Dhaka 1100. Cover Designed by Quyyum Chowdhury. Price : Taka Eighty Only.

উৎসর্গ

ড. আহমদ শরীফ

মুখবন্ধ

এই লেখাটি দৈনিক 'বাংলাবাজার পত্রিকা'র সাহিত্য সাময়িকীর পাতায় প্রায় চার মাস ধরে প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার কিস্তিগুলো পাঠ করে তাৎক্ষণিকভাবে অনেকেই তারিফ করেছিলেন। তার মধ্যে অধ্যাপক রাজ্জাকের প্রাক্তন ছাত্র এবং কতিপয় ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিও ছিলেন। আবার কতিপয় মানুষের মুখে এরকম অভিযোগও উচ্চারিত হতে শুনেছি, আমি যেসব কথা অধ্যাপক রাজ্জাকের জবানিতে প্রকাশ করেছি, আসলে সেগুলো রাজ্জাক সাহেব বলেননি, আমি নিজে বানিয়ে বানিয়ে লিখেছি।

একটি লেখা যখন কাগজে প্রকাশিত হয়, তা সকল পাঠকের মনে সমান আবেদন সৃষ্টি করে না। কারও ভালো লাগে, কারও লাগে না। আমার লেখাটির ব্যাপারেও পক্ষে বিপক্ষে কে কী বললেন সেটা আমার বিশেষ বিচার্য বিষয় হয়ে ওঠেনি। আমি যে জিনিসটির উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলাম : আমার শিক্ষক অধ্যাপক রাজ্জকের অনন্য ব্যক্তিত্বের মহিমা আমি যেভাবে অনুভব করেছি, অন্তত তার কিছুটা উত্তাপ দশজনের কাছে প্রকাশ করি। মুখ্যত এই উদ্দেশ্য নিয়েই রচনাটি লিখতে প্রবৃত্ত হই। স্যারের কাছে উনিশ'শ সত্তর সালের শেষের দিকে যাওয়া-আসা শুরু করেছিলাম, এখনও সেই প্রক্রিয়াটির ইতি ঘটেনি।

আমার স্বভাবটাই এমন, একজন মানুষ, তিনি যতো বড় ব্যক্তিত্বই হোন, বেশিদিন আমার আগ্রহ এবং কৌতূহল উদীপ্ত রাখতে পারেন না। অতি সহজেই তাঁরা পুরনো হয়ে যান। তখন তাঁদের ছেড়ে যাওয়া ছাড়া আমার কোনো উপায় থাকে না। স্বভাবের এই একঝোঁকা প্রবণতাটির জন্য জীবনে আমি কম দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হইনি। সাতাশ বছর ধরে রাজ্জাক স্যারের সান্নিধ্য লাভ করে আসছি, রাজ্জাক সাহেব আমার কাছে একদিনের জন্যও পুরনো হয়ে যাননি। প্রতিবারই তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং জানাশোনার পরিধি আমার চোখে নতুন নতুন চমক সৃষ্টি করেছে। প্রথম দিন তাঁর সঙ্গে কথা বলে যেভাবে বিস্মিত হয়েছিলাম, এখনও একই ধরনের বিস্ময় তিনি আমার মধ্যে

সৃষ্টি করেন। ভক্তি কিংবা শ্রদ্ধার প্রকাশ এ রচনায় কতটুকু ঘটেছে আমি তা জানিনে। বিস্ময়বোধের কারণেই স্যারের উপর এ রচনাটি লিখতে বাধ্য হয়েছি।

আমার এ রচনাটিকে কেউ যদি নিছক সাক্ষাৎকারধর্মী রচনা মনে করেন, আমার ধারণা, লেখাটির উপর কিঞ্চিৎ অবিচার করা হবে। আমি রাজ্জাক স্যারের সমগ্র ব্যক্তিত্বটি স্পর্শ করতে চেষ্টা করেছি। আমার অক্ষমতার পরিমাণ অপরিসীম। আমি রাজ্জাক স্যার সম্পর্কে যত জানি, তাঁকে যতদূর বুঝতে পারি, এসব বিষয়ে আমার চাইতে ঢের ঢের কামেল ব্যক্তি সংসারে এখনও বেঁচে-বর্তে রয়েছেন। আর রাজ্জাক স্যারের উপর লেখা এটি একমাত্র গ্রন্থ নয়।

রাজ্জাক স্যারের ওপর কোনোকিছু লিখে প্রকাশ করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাপার। এই ঝুঁকি দু'দিক থেকেই। রাজ্জাক স্যার নানা স্পর্শকাতর বিষয়ে এমন একতরফা মতামত দিয়ে বসেন, যেটা সমাজের মানুষ বরদাশ্‌ত করতে অনেক সময়ই প্রস্তুত নয়। অন্যদিকে তাঁর বক্তব্যের উপস্থাপনায় যদি সামান্য হেরফেরও ঘটে যায়, তিনি সেটা সহজভাবে মেনে নিতে রাজি হবেন না। এই দু'ধরনের ঝুলন্ত খড়্গ মাথার ওপর রেখে রচনাটি আমাকে লিখতে হয়েছে। এ গ্রন্থের সব কথা রাজ্জাক সাহেবের। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আমি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সংযোজিত করেছি। এটি করতে গিয়ে দু'-ধরনের স্বেচ্ছাচারিতা প্রশ্রয় পেয়েছে। কোথাও কোথাও তাঁকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, কারও কারও দৃষ্টিতে তা অনাবশ্যক বড় করে দেখানো বলে প্রতিভাত হতে পারে। প্রথম পুরুষে যেহেতু রচনাটি লিখিত হয়েছে, লেখকের ভূমিকাটি কোথাও কোথাও প্রবল হয়ে উঠেছে, এমন মনে হওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়।

রাজ্জাক স্যারের অত্যন্ত স্নেহভাজন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. আনিসুজ্জামানকে এ রচনাটির মুখবন্ধ লিখে দেয়ার জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিলাম, তিনি রাজিও হয়েছিলেন। পরে ভেবে দেখলাম এই লেখায় আমি অনেকগুলো গুরুতর অপরাধ করে ফেলেছি। আমার অপরাধ-খালনের বোঝা আমার শিক্ষকের ওপর আরোপ করা ঠিক হবে না বলেই মুখবন্ধটি রচনার দায়িত্বটি নিজেকে গ্রহণ করতে হলো।

বিনীত
আহমদ ছফা

উত্থানপর্ব কার্যালয়
৭১ আজিজ সুপার মার্কেট
ঢাকা ১০০০
১লা ফাল্গুন ১৪০৪

এক

"যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি বাড়ি যায়
তথাপি তাহার নাম নিত্যানন্দ রায়।"

উনিশশো সত্তর সালের কথা। বাংলা একাডেমী তিন বছরের ফেলোশিপ প্রোগ্রামে প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করে সংবাদপত্রে একটা বিজ্ঞাপন প্রকাশ করলো। বন্ধুবান্ধব সকলে বললো, তুমি একটা দরখাস্ত ঠুকে দাও। যদি বৃত্তিটা পেয়েই যাও, তা হলে তিন বছরের নিরাপদ জীবিকা। গবেষণা হয়তো হবে, না হলেও ক্ষতি নেই। প্রস্তাবটা আমার মনে ধরলো। কিন্তু গোল বাধলো এক জায়গায় এসে। তখনও আমার এমএ পরীক্ষা শেষ হয়নি। ছাত্রদের দাবির মুখে পিছোচ্ছে তো পিছোচ্ছেই। এদিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন গতিবেগ সঞ্চয় করে ক্রমাগত ফুঁসে উঠছে। পরীক্ষা কবে শেষ হবে তার কোনো ঠিক নেই। আমি যদি পরীক্ষার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি, দরখাস্ত করার সময় পেরিয়ে যাবে।

আমি একাডেমীর পরিচালক জনাব কবীর চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁকে বুঝিয়ে রাজি করাতে পারলাম, যদিও এমএ ডিগ্রী আমার হয়নি, অন্তত তিনি আমার দরখাস্তটা গ্রহণ করতে যেনো অমত না করেন। কবীর চৌধুরী সাহেব বললেন, ঠিক আছে, তুমি দরখাস্ত করো। অন্যান্য প্রার্থীর আবেদনপত্রের সঙ্গে তোমারটাও আমি বোর্ডে তুলবো। বোর্ডের সদস্যবৃন্দ দেখেশুনে যাকে ইচ্ছে নির্বাচন করবেন। সুতরাং এমএ ডিগ্রী না থাকা সত্ত্বেও বাংলা একাডেমীর পিএইচডি ফেলোশিপ প্রোগ্রামে দরখাস্ত করে বসলাম।

অন্য প্রার্থীদের মতো আমিও ইন্টারভ্যু কার্ড পেলাম। আর নির্দিষ্ট দিনে কক্ষে ইন্টারভ্যু বোর্ডের সামনে হাজির হলাম। ড. আহমদ শরীফ, প্রফেসর

মুনীর চৌধুরী এবং ড. এনামুল হক সেদিন ইন্টারভ্যু বোর্ডে উপস্থিত ছিলেন। ড. এনামুল হক ছাড়া বাকি সদস্যদের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিলো। আর তাঁরা সকলেই ছিলেন আমার শিক্ষক। আমার লেখালেখির সঙ্গে তাঁরা সকলে অল্পবিস্তর পরিচিতও ছিলেন। আমাকে প্রশ্ন যা করার ড. মুহম্মদ এনামুল হকই করলেন। তিনি দরখাস্তের ওপর চোখ বুলিয়ে গুরুগম্ভীর স্বরে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার সাহস তো কম নয় হে, এমএ পরীক্ষা না দিয়েই একেবারে পিএইচডি করার দরখাস্ত নিয়ে হাজির। ড. এনামুল হক ভীষণ রাশভারি মানুষ। পারতপক্ষে জুনিয়র কলিগরাও তাঁর কাছে ঘেঁষতে সাহস পেত না। ঘিয়ে রঙের স্যুট এবং কালো টাই পরিহিত ড. এনামুল হককে একটা আস্ত বুড়ো বাঘের মতো দেখাচ্ছিলো। চোখের ভুরু থেকে মাথার চুল একেবারে পাকনা। মাথার মাঝখানে সযত্নে সিঁথি করা। আমার অবস্থা তখন ক্ষুধার্ত বুড়ো বাঘের সামনে কচি নধর গোবৎসের মতো। এই বুঝি লাফিয়ে পড়ে আমার মুণ্ডুটা চিবিয়ে খাবেন। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কাজ করলো। মনেমনে চিন্তা করলাম, এই বুড়োর সামনে আমি যদি রুখে না দাঁড়াই, তিনি আমার চোখের পানি নাকের পানি এক করে ছাড়বেন। তাই সরাসরি তাঁর কড়া পাওয়ারের চশমার কাঁচের ওপর চোখ রেখেই বললাম, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এমএ পাশ না করেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করেছেন। মোহিতলাল মজুমদারও এমএ পাশ ছিলেন না, তথাপি এখানে শিক্ষকতা করেছেন। আমি তো এমএ পাশ করবোই, দু'চার মাস এদিক–ওদিকের ব্যাপার। দরখাস্ত করে অন্যায়টা কী করেছি? শুনে ড. এনামুল হক কনে আঙুলটা মুখের ভেতর পুরে দিয়ে আমার দরখাস্তের সঙ্গে দাখিল করা থিসিসের পরিকল্পনার শিটগুলোর ওপর চোখ বুলোতে বুলোতে প্রশ্ন করলেন, তুমি কোন বিষয়ের ওপর কাজ করবে? কণ্ঠস্বর শুনে মনে হল ঝাঁঝ অনেকটা কমে এসেছে। আমি বিনীতভাবে জবাব দিলাম, আঠারোশো থেকে আঠারোশো আটান্ন সাল পর্যন্ত বাংলায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব, বিকাশ এবং বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতি এবং রাজনীতিতে তার প্রভাব। তখন ড. হক বললেন, তুমি মধ্যবিত্ত বলতে কী বোঝো সে বিষয়ে কিছু বলো। আমি হ্যারল্ড লাস্কি, বি.বি. মিশ্রের ইংরেজি গ্রন্থ থেকে যে সকল বচনামৃত বিনিদ্র রজনীর শ্রমে কণ্ঠস্থ করেছিলাম গড়গড় করে উগরে দিতে থাকলাম। ড. এনামুল হক ব্যাকরণের মানুষ। সমাজবিজ্ঞানের কচকচির ওপর দেখা গেল তাঁর কোনো আগ্রহ নেই। চেয়ারটাতে হেলান দিয়ে মুনীর চৌধুরী সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনাদের প্রশ্ন থাকলে করেন। মুনীর চৌধুরী সাহেব ড. এনামুল হকের মনে আমার সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা সৃষ্টি করার

জন্য বললেন, ছেলেটার লেখার হাত ভালো এবং তরুণদের ওপর যথেষ্ট প্রভাব। আর কেউ প্রশ্ন করলেন না। কবীর চৌধুরী সাহেব বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে তুমি যাও।

সেদিনই ঘণ্টা দুই পরে জানা গেলো আমাকে বিশেষ বিবেচনায় বাংলা একাডেমী গবেষণাবৃত্তির জন্য মনোনয়ন দিয়েছে। তার পরের দিন বাংলা বিভাগে মুনীর চৌধুরী সাহেবকে কৃতজ্ঞতা জানাতে গেলাম। তিনি তখন বিভাগীয় প্রধান। আমাকে দেখেই তিনি জিগ্‌গেস করলেন, তুমি তো এমএ করছো পলিটিক্যাল সায়েন্সে? আমি হাঁ বললাম। তিনি তখন বললেন, তোমার থিসিসটা বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিস্ট্রেশন করার সময় বাংলা বিভাগ থেকেই করতে হবে।

মুনীর চৌধুরী সাহেবের প্রস্তাবটা আমার মনঃপুত হয়নি। তথাপি সৌজন্যের খাতিরে আমি চুপ করে রইলাম। তিনি আমার মুখ দেখেই বুঝে নিলেন, তাঁর প্রস্তাবটা আমি গ্রহণ করিনি। তিনি বললেন, আমরা তোমাকে তিন বছর পড়িয়েছি। মাঝখান থেকে তুমি হুট করে পলিটিক্যাল সায়েন্সে পরীক্ষা দিয়ে বসলে। বুঝেছি, তুমি আমাদের ছাড়তে চাও। কিন্তু তোমাকে আমরা ছাড়বো কেনো? তুমি বাংলা বিভাগের অধীনে কাজ করতে রাজি না হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে থিসিস রেজিস্ট্রেশন করতেই দেবো না। আমি মুনীর চৌধুরী সাহেবের গুণগ্রাহিতার পরিচয় পেয়ে অভিভূত হয়ে গেলাম। কিন্তু নিজের সিদ্ধান্তে অটল রইলাম।

ইন্টারভ্যুর প্রায় পনেরো দিন আগে মুনীর চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে দেখা করে অনুরোধ করেছিলাম, তিনি যেনো সুপারিশ করেন, যাতে বাংলা একাডেমীর বৃত্তিটা পাই। চৌধুরী সাহেব আমাকে বলেছিলেন, যেহেতু তোমার এমএ–টা এখনও শেষ হয়নি, বাংলা একাডেমী তোমার আবেদন বিবেচনা নাও করতে পারে। তুমি যদি রাজি থাকো আমি তোমাকে অস্ট্রেলিয়া পাঠিয়ে দিতে পারি। ভাষাতত্ত্বের ওপর পিএইচডি করতে হলে শুধু গ্র্যাজুয়েশন থাকলে ওরা আপত্তি করবে না।

মুনীর চৌধুরী সাহেবের প্রস্তাব শুনে উল্লসিত হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু পরক্ষণে নিজের ভেতর থেকে অনুভব করলাম, একটা সূক্ষ্ম আপত্তি জেগে উঠছে। আমি মাথা নিচু করে রইলাম এবং মেঝের দিকে তাকিয়ে বললাম, দুয়েক দিন ভেবে আপনাকে বলবো।

মুনীর চৌধুরী সাহেবের প্রস্তাবটা গ্রহণ করবো কি না খুঁটিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে আমার চোখে পানি এসে গেল। দেশের বাইরে যাওয়ার এরকম একটা

স্কলারশিপ পেলে আমি বর্তে যাই। সুযোগটা আপনি এসে ধরা দিয়েছে। আমার নিজেকে ভাগ্যবান মনে করা উচিত। কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত নিলাম অত্যন্ত সৌজন্য সহকারে প্রফেসর মুনীর চৌধুরীর প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যানই করবো। আর এই প্রত্যাখ্যান করতে হচ্ছে বলেই চোখে পানি এসে গিয়েছিল। সুযোগ তো জীবনে বারবার আসে না।

আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ভরতি হয়েছিলাম এবং তিন বছর পড়াশোনা করেছি। খুব ভালো ছাত্র না হলেও আমার বুদ্ধি বিবেচনা নিতান্ত তুচ্ছ পর্যায়ের ছিল না। মাতৃস্তন্যে শিশুর যেরকম অধিকার, শিক্ষকদের স্নেহের ওপরও ছাত্রদের সেরকম অধিকার থাকা উচিত। সেই স্নেহ আমি শিক্ষকদের কাছ থেকে পাইনি। তার পরিণতি এই হল যে আমি বাংলা বিভাগ ছেড়ে দিলাম এবং প্রাইভেট প্রার্থী হিসেবে পরীক্ষা দিয়ে বিএ পাস কোর্সে পাশ করলাম। বিএ পাশ করার পর ঠিক করেছিলাম, অধিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার আমার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমাকে আবার প্রাইভেটে পলিটিক্যাল সায়েন্সে এমএ পরীক্ষা দিতে হলো। সমস্ত বিষয়টা আমি এভাবে চিন্তা করলাম। শিক্ষকদের কাছ থেকে সামান্য উৎসাহ অনুপ্রেরণা যখন আমার ভীষণ প্রয়োজন ছিলো, সেই সময়ে কেউ আমার দিকে মুখ তুলে তাকাননি। এখন আমি নিজের চেষ্টায় উঠে আসতে শুরু করেছি, সকলে আমাকে অনুগ্রহ বিতরণ করে কৃতজ্ঞতাপাশে বাঁধতে চাইছেন। আমি মনে মনে স্থির করলাম, যে বস্তু প্রয়োজনের সময় হাজারবার কামনা করেও পাইনি, সেই বিশেষ সময়টি চলে যাওয়ার পর তার কিছু ক্ষতিপূরণ যদি আমার কাছে সেধে এসে ধরাও দেয়, আমি গ্রহণ করতে পারবো না। এই গ্রহণ করতে পারছি না বলেই চোখে পানি এসে গিয়েছিল। এরই মধ্যে একদিন তাঁর অফিসে গিয়ে বললাম, স্যার, ভাষাতত্ত্ব বিষয়টার প্রতিই আমি আকর্ষণ অনুভব করি না। সুতরাং উচিত হবে, স্কলারশিপটার জন্য অন্য কাউকে বেছে নেয়া। তিনি কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

মুনীর চৌধুরী সাহেব ছিলেন অত্যন্ত সংবেদনশীল মানুষ এবং তাঁর বোধশক্তি ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। আমার ধারণা তিনি আমার অকথিত অভিযোগটি আঁচ করতে পেরেছিলেন। সে কারণেই আমার থিসিসটা বাংলা বিভাগের অধীনে রেজিস্ট্রেশন করার জন্য চাপাচাপি করছিলেন। আমাদের ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হতে হতে উনিশশো একাত্তর সালের মার্চ মাস এসে গেলো। মার্চ মাসের একুশ তারিখে আমাদের ভাইভা-ভোসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হল। পঁচিশে মার্চ তারিখের মধ্যরাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তো ঘুমন্ত ঢাকা নগরীর ওপর আক্রমণ করেই বসলো। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলো। নয় মাস পর যখন ভারত থেকে দেশে

এলাম, তখন প্রফেসর মুনীর চৌধুরী বেঁচে নেই। পাকিস্তানপন্থী রাজাকার–বাহিনী তাঁকে অন্যান্য বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে রায়ের বাজারের বধ্যভূমিতে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে। তাঁর জন্য শোকার্ত সকল মানুষের সঙ্গে কণ্ঠ মেলাতে গিয়েও আমার একান্ত ব্যক্তিগত বেদনাটুকু বড় বেশি করে অনুভব করছিলাম। আমি এমন একজন মানুষকে হারালাম যিনি অভিমানের ভাষা বুঝতে পারতেন।

আমার একটা অপরাধবোধ রয়েছে। প্রচলিত নিয়ম ভেঙে সুযোগ দেয়ার পরও আমার পক্ষে পিএইচডি করা সম্ভব হয়নি। একা একা যখন চিন্তা করি আমার মনে একটা অপরাধবোধ ঘনিয়ে আসে। হয়তো আমি নিজের উগ্র অহংটাকে বড় বেশি প্রাধান্য দিয়ে প্রফেসর মুনীর চৌধুরীর উদারতার প্রতি অবিচার করেছিলাম। আজকাল সেরকম একটা অনুভূতি আমার মধ্যে জাগ্রত হয়। বোধহয় সেজন্য আমার পক্ষে পিএইচডি করা সম্ভব হয়নি। এটা হচ্ছে আমার অনুভব। পিএইচডি শেষ করতে না পারার অন্য যে বাস্তব কারণ তার জন্য প্রফেসর আবদুর রাজ্জাককে আমি দায়ী মনে করি।

দুই

প্রফেসর আবদুর রাজ্জাকের সঙ্গে পরিচিত হওয়া আমার জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহের একটি। দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা নির্মাণে, নিষ্কাম জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে, প্রচলিত জনমত উপেক্ষা করে নিজের বিশ্বাসের প্রতি স্থিত থাকার ব্যাপারে প্রফেসর আবদুর রাজ্জাকের মতো আমাকে অন্য কোনো জীবিত বা মৃত মানুষ অতোটা প্রভাবিত করতে পারেনি। প্রফেসর রাজ্জাকের সান্নিধ্যে আসতে পারার কারণে আমার ভাবনার পরিমণ্ডল বিস্তৃততর হয়েছে, মানসজীবন ঋদ্ধ এবং সমৃদ্ধতরো হয়েছে। আমি যদি বসওয়েলের মতো পরিপাটি স্বভাবের মানুষ হতাম, কিংবা একারমানের মতো শৃঙ্খলানিষ্ঠ আনুগত্য আমার থাকত, বসওয়েল যেভাবে জনসনের একটি বিশ্বাসযোগ্য চরিত্র সকলের সামনে তুলে ধরতে পেরেছেন, অথবা একারমান যেরকম অখণ্ড বিশ্বস্ততা সহকারে দিন তারিখ প্রহর উল্লেখ করে মহাকবি গ্যোতের কথোপকথন লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন, সে ধরনের একটা গ্রন্থ প্রফেসর রাজ্জাকের ওপর রচনা করা হয়তো

আমার পক্ষে অসম্ভব হত না। আমি গল্প কবিতা উপন্যাস এসকল জিনিস লিখে থাকি এবং লিখে আনন্দ পেয়ে থাকি। সৃষ্টিশীল মানুষেরা সাধারণত বিপজ্জনক ধরনের হয়ে থাকেন। বাইরে তাঁরা যতোই নিরীহ এবং অপরের প্রতি মনোযোগী হয়ে থাকুন না কেনো ভেতরে তাঁদের স্বেচ্ছাচারী হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। যেখানে আত্মপ্রকাশের বিষয়টি অপর সকল কিছুকে ছাপিয়ে ওঠে, সেখানে ব্যক্তিকে অনিবার্যভাবে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে হয়। সৃষ্টিধর্মের নিয়ম ছাড়া বাইরের কোনো নিয়ম সেখানে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠতে পারে না।

উনিশশো বাহাত্তর সাল থেকে শুরু করে উনিশশো চুরাশি সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় এক যুগ সময়ের সবটাই কম করে হলেও অন্তত সপ্তাহে একবার প্রফেসর রাজ্জাকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। নানা বিষয়ে তাঁর বক্তব্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুগ্ধ হয়ে শুনেছি। ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাকার বিষয়ের ওপর যেসকল কথা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তিনি বলে গেছেন, সেগুলো যদি দিন তারিখ উল্লেখ করে যথাযথভাবে টুকে রাখতে পারতাম, আমি আমার দেশের মানুষের সামনে জ্ঞানবিজ্ঞানের একটা রত্নভাণ্ডারের পরিচয় তুলে ধরতে পারতাম। এই রচনার পরবর্তী অংশে আমি সেসকল কথাই বলবো, যেগুলো অদ্যাবধি আমার পক্ষে ভুলে যাওয়া সম্ভব হয়নি। আমার দ্বিধা এবং শঙ্কার পরিমাণও সামান্য নয়। প্রফেসর রাজ্জাক যে স্পিরিটে কথা বলেছেন আমার উপস্থাপনায় সে জিনিসটি অবিকৃতভাবে রক্ষিত হয়েছে এমন দাবি করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শোনা কথা স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে উপস্থাপন করার বেলায় মূলের অনেক কিছুই হারিয়ে যেতে পারে। আমার ক্ষেত্রেও সেটি যে ঘটেনি এমন কথা আমি বলতে পারবো না।

বিগত অর্ধশতাব্দীরও অধিক সময় ধরে আমাদের দেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের একটা বিরাট অংশ প্রফেসর রাজ্জাকের সংস্পর্শে এসেছেন। তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজসমূহ, আমলাতন্ত্র, রাজনীতি এবং আইন ইত্যাকার নানা পেশার মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছেন। তাঁদের একাংশ মারা গেছেন। তা সত্ত্বেও একটা বিরাট অংশ অদ্যাবধি জীবিত আছেন। তাঁদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি রয়েছেন, যাঁরা প্রফেসর রাজ্জাকের সংস্পর্শে এসেছেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের চুম্বকের মতো একটা আকর্ষণী শক্তি অবশ্যই আছে। বিদেশের অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তিও নানা সময়ে প্রফেসর রাজ্জাকের ব্যক্তিত্বের সম্মোহনে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। পরবর্তী জীবনে তাঁদের কেউ–কেউ বিশ্বব্যাপী খ্যাতি এবং পরিচিতির অধিকারী হয়েছেন। সে তুলনায় আমি নিতান্তই সামান্য মানুষ। প্রফেসর রাজ্জাকের একনিষ্ঠ ভক্ত অগ্রজপ্রতিম অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিম তাঁর সঙ্গে

আলাপচারিতার ভিত্তিতে যে অসাধারণ গ্রন্থটি রচনা করেছেন সেরকম যোগ্যতা, একাগ্রতা এবং বিষয়নিষ্ঠা আমি কোথায় পাবো? আমি এই রচনার পরবর্তী অংশে প্রফেসর রাজ্জাককে উপলক্ষ করে যেসকল কথা বলছি, তার মধ্যে প্রফেসর রাজ্জাক কতটুকু আছেন, আমি কতটুকু, ভেদরেখাটি আমার কাছেও স্পষ্ট নয়। মোটের ওপর এ রচনাটি দাঁড়াচ্ছে মহাকবি আলাওলের ভাষায়—"গুরু মুহম্মদে করি ভক্তি, স্থানে স্থানে প্রকাশিব নিজ মনোউক্তি" অনেকটা এরকম।

আমি বন্ধুবান্ধবদের কাছে একজন জ্ঞানী শিক্ষকের নাম জানতে চেয়েছিলাম, যাঁকে আমার পিএইচডি থিসিসটির পরামর্শক হিসেবে বেছে নিতে পারি। সকলে আমাকে বললেন তুমি রাজ্জাক সাহেবের কাছে যাও। তাঁর মতো পণ্ডিত আর একজনও নেই। সে সময়ে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে পলিটিক্যাল সায়েন্সে পরীক্ষা দিচ্ছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি বাংলা বিভাগের ছাত্র ছিলাম। সুতরাং বাংলা বিভাগের বাইরে অন্যান্য বিভাগের শিক্ষকদের মধ্যে মাত্র দুয়েকজনকে চিনতাম। পলিটিক্যাল সায়েন্সের ম্যাক মানে মোজাফফর আহমদ চৌধুরী সাহেবকে দূর থেকে দেখেছি। আবদুর রাজ্জাক নামের একজন শিক্ষক আছেন জানতে পারলাম, যখন আমার পিএইচডি থিসিসের একজন সুপারভাইজার বেছে নেয়ার কথা উঠল।

আমি স্থির করলাম একদিন রাজ্জাক সাহেবের বাড়িতে গিয়ে আমার থিসিসের সুপারভাইজার হওয়ার অনুরোধটা করবো। বন্ধুবান্ধবেরা আমাকে এ মর্মে হুঁশিয়ার করে দিল যে রাজ্জাক সাহেব ভীষণ নাকউঁচু স্বভাবের মানুষ। বাঘা বাঘা লোকেরাও তাঁর কাছে ঘেঁষতে ভীষণ ভয় করেন। সুতরাং কথাবার্তা সাবধানে বলবে। যদি তাঁর অপছন্দ হয়, পত্রপাঠ দরোজা দেখিয়ে দেবেন। অনেক দ্বিধা, অনেক শঙ্কা এবং সঙ্কোচ নিয়ে একদিন বিকেলবেলা প্রফেসর রাজ্জাকের বাড়িতে গেলাম। তখন তিনি শহীদ মিনারের বিপরীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের কোয়ার্টারের একটিতে নিচের তলায় থাকতেন। দরোজা আধভেজানো অবস্থায় ছিল। আমি খানিকক্ষণ ইতস্তত করছিলাম। যদি দরোজা ঠেলে সোজা ঢুকে পড়ি কেমন দেখাবে? মনে তো শঙ্কা ছিলোই। কোনো আচরণ যদি বেয়াদবি ঠেকে? বেশ কিছু সময় অপেক্ষা করার পরও কাউকে না পেয়ে আমি ভয়ে ভয়ে দরোজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করলাম।

ঘরটির পরিসর বিশেষ বড় নয়। চারদিক বইপুস্তকে ঠাসা। ঘরটিতে একটিমাত্র খাট, না, খাট বলা ঠিক হবে না, চৌকি। সামনে একটি ছোটো টেবিল। চৌকিটির আবার একটি পায়া নেই। সেই জায়গায় বইয়ের ওপর বই রেখে ফাঁকটুকু ভরাট করা হয়েছে। চমৎকার ব্যবস্থা। পুরোনো বইপত্রের

আলাদা একটা গন্ধ আছে। আমি সেই বইপত্রের জঞ্জালে হতবিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। এই ঘরে যে কোনো মানুষ আছে প্রথমে খেয়ালই করিনি। হঠাৎ দেখলাম চৌকির ওপর একটা মানুষ ঘুমিয়ে আছে। একখানা পাতলা কাঁথা সেই মানুষটার নাক অবধি টেনে দেয়া। চোখ দুটি বোজা। মাথার চুল কাঁচাপাকা। অনুমানে বুঝে নিলাম, ইনিই প্রফেসর রাজ্জাক। ঘরে দ্বিতীয় একজন মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে খাটেশোয়া মানুষটি কী করে বুঝে গেলেন। তিনি চোখ খুলে নাকমুখ থেকে কাঁথাটি সারিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কেডা?

আমি চৌকির একেবারে কাছটিতে গিয়ে সালাম দিলাম এবং নাম বললাম।

তিনি ঘুম–জড়ানো স্বরেই জানতে চাইলেন, আইছেন ক্যান হেইডা কন।

আমাকে বলতেই হলো, বাংলা একাডেমী আমাকে পিএইচডি করার জন্য একটা বৃত্তি দিয়েছে। আমি তাঁর কাছে এসেছি একটা বিশেষ অনুরোধ নিয়ে, তিনি যেনো দয়া করে আমার গবেষণার পরামর্শক হতে সম্মত হন। আমার আর্জিটা যথাসম্ভব বিনয়নম্র জবানে প্রকাশ করলাম। কিন্তু প্রফেসর রাজ্জাকের মধ্যে তার সামান্যতম প্রতিক্রিয়াও লক্ষ করা গেলো না। তিনি পাশ ফিরে কাঁথাটি নাকমুখ অবধি টেনে দিলেন। আমার এত বিনীত আবেদন এত নীরবে কোনো মানুষ প্রত্যাখ্যান করতে পারে আমি চিন্তাও করতে পারিনি। তখন আমার দুটি কি তিনটি বই প্রকাশিত হয়েছে এবং মনেমনে অনেক সেয়ানা হয়ে উঠেছি। আমার আত্মাভিমানে একটু ঘা লাগলো। নিজেকেই জিগ্গেস করলাম, কেমন মানুষ এই প্রফেসর রাজ্জাক। আমি একটা অনুরোধ করলাম, আর শুনেই তিনি পাশ ফিরলেন। আমি তো অন্ততপক্ষে একজন লেখক। নিজের কাছে আমার দাম অল্প নয়। তিনি যেদিকে পাশ ফিরেছেন আমি ঘুরে চৌকির সেই পাশটিতে গিয়ে আবার বললাম, স্যার, আপনাকে আমার থিসিসের সুপারভাইজার হওয়ার জন্য অনুরোধ করতে এসেছি। আমার আর্জি দ্বিতীয়বার শুনে প্রফেসর রাজ্জাক আবার উত্তর দিকে পাশ ফিরলেন।

আমার ভীষণ রাগ ধরে গেলো। কেমনতরো মানুষ প্রফেসর রাজ্জাক! তাঁর কাছে একটা আবেদন করলাম। তিনি ভালোমন্দ কোনো জবাব না দিয়ে নীরব প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে আমাকে বিদায় করতে চান। হতবাক হয়ে আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। এইভাবে অপমানিত হয়ে যদি আমি চলে আসি আমার নিজের কাছে নিজে ছোট হয়ে যাই। কিছু একটা করা প্রয়োজন, কিন্তু কী করা যায়! প্রফেসরের বইয়ের গুদামে যদি আগুন লাগিয়ে দেয়া যেতো, মনের ঝাল কিছুটা মিটতো। কিন্তু সেটিতো আর সম্ভব নয়। আমি দু'হাত দিয়ে তাঁর শরীর থেকে

কাঁথাটি টেনে নিয়ে দলা পাকাতে পাকাতে বললাম, আমার মতো একজন আগ্রহী যুবককে আপনি একটি কথাও না বলে তাড়িয়ে দিতে পারেন, এত বিদ্যা নিয়ে কী করবেন? বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো তিনি চৌকির ওপর উঠে বসলেন। পরনের সাদা আধময়লা লুঙ্গিটা টেনে গিটঠু দিলেন। তারপর চশমাটা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে কাচ মুছে নাকের আগায় চড়ালেন। খুব সম্ভব বাইফোকাল গ্লাস। আমি তাঁর দৃষ্টিশক্তির তীব্রতা অনুভব করলাম। কোনো মানুষের চোখের দৃষ্টি এত প্রখর হতে পারে আমার কোনো ধারণা ছিল না। তিনি আমার খদ্দরের পাজামা পাঞ্জাবি, পরনের স্পঞ্জ এবং ধুলোভর্তি মলিন চরণ সবকিছুর ওপর এক ঝলক দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। তারপর আঙুল দিয়ে একটা আধাভাঙা কাঠের চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বললেন, ওইহানে বয়েন।

আমি যখন বসলাম, তিনি ভেতরে গেলেন। একটু পরে মুখে পানি দিয়ে ফিরে এলেন। তারপর খদ্দরের চাদরটা টেনে নিয়ে গায়ের ওপর মেলে দিলেন। আমার মনে হল তাঁর পরনের গেঞ্জির বড় বড় ফুটো দুটো আমার দৃষ্টি থেকে আড়াল করার জন্যই চাদরটার সাহায্য নিলেন। যুত করে চেয়ারে বসার পর আমাকে বললেন, কী কইবার চান, অখন কন।

আমি বললাম, আমি বাংলা একাডেমী থেকে পিএইচডি করার একটা ফেলোশিপ পেয়েছি, আমার খুব শখ আপনার অধীনে আমি গবেষণার কাজটা করি।

তিনি বললেন, গবেষণা করবেন হেইডা ত ভালা কথা। কিন্তু আমি ত আপনের থিসিসের সুপারভাইজার থাকবার পারুম না।

প্রফেসর রাজ্জাকের কণ্ঠস্বর শুনে মনে হলো, তিনি আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন বলে একটা সিদ্ধান্ত এরই মধ্যে নিয়ে ফেলেছেন। আমি বললাম, কেনো স্যার?

অফিসিয়ালি থিসিস সুপারভাইজ করনের লাইগ্যা মিনিমাম রীডার অওন লাগে। আমি ত মোটে লেকচারার। সুতরাং আপনের শখ পূরণ অওনের কোনো সম্ভাবনা নাই।

তাঁর কথা শুনে আমি দমে গেলাম। তার পরেও বললাম, অন্য কারও অধীনে থিসিসটা রেজিস্ট্রেশন নাহয় করলাম। তাঁর পরামর্শ এবং নির্দেশনা নিয়েই আমি কাজটা করতে চাই। প্রফেসর রাজ্জাক বললেন, আপনের টপিক মানে বিষয়বস্তুটা কী?

আমি বললাম, দ্যা গ্রোথ অব মিডল ক্লাস ইন বেঙ্গল অ্যাজ ইট ইনফ্লুয়েন্সড ইটস্ লিটারেচার, সোসাইটি অ্যানড ইকনমিকস ফ্রম এইটিনথ টু এইটিনথ ফিফটি এইট।

প্রফেসর রাজ্জাক বললেন, এক্কেরে ত সাগর সেঁচার কাম। কার বুদ্ধিতে এই গন্ধমাদন মাথায় লইছেন?

আমি বললাম, অন্য কারও পরামর্শে নয়, আমি নিজেই বিষয়টা বেছে নিয়েছি।

প্রফেসর রাজ্জাক কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। এরই মধ্যে কাজের ছেলেটা কল্কিতে তামাক দিয়ে গেলো। কয়েকটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, রেজিস্ট্রেশন ফর্ম রেডি করছেন?

আমাকে বলতে হল, আমাকে বৃত্তিটা দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেটা কার্যকর হবে এমএ–র রেজাল্টের পর। এখন পরীক্ষা চলছে।

তিনি বললেন, আগে পরীক্ষা দিয়া লন। যখন রেজাল্ট বাইর অইব তখন আয়েন।

আমি সালাম করে চলে আসছিলাম। তিনি বললেন, আরেকটু বইয়েন, এক পেয়ালা চা খাইয়া যান। তিনি বিন্তি বলে কাউকে ডাকলেন। একটি গোলগাল ফর্সা কিশোরী বেরিয়ে এলে আমাকে জিগ্গেস করলেন, কী য্যান কইলেন আপনের নাম?

আমি বললাম, আহমদ ছফা।

তিনি বললেন, মৌলবি আহমদ ছফাকে এক পেয়ালা চা দে।

প্রফেসর রাজ্জাকের বাড়ি থেকে ফিরে আসার সময় তিনটে জিনিস আমার মনে দাগ কেটে বসে গিয়েছে। প্রথমত তাঁর চোখের দৃষ্টি অসাধারণ রকম তীক্ষ্ণ। একেবারে মর্মে গিয়ে বেঁধে। দ্বিতীয়ত ঢাকাইয়া বুলি তিনি অবলীলায় ব্যবহার করেন, তাঁর মুখে শুনলে এই ভাষাটি ভদ্রলোকের ভাষা মনে হয়। তৃতীয়ত আমাকে তিনি মৌলবি আহমদ ছফা বললেন কেনো? আদর করে বললেন, নাকি অবজ্ঞা করলেন? পরের বছরগুলোতে যতোবারই তাঁর কাছে গিয়েছি প্রতিবারই প্রথম সম্বোধনে জিগ্গেস করেছেন, মৌলবি আহমদ ছফা কী খবর?

তিন

উনিশশো বাহাত্তর সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমি প্রফেসর রাজ্জাকের সঙ্গে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রথমবার দেখা করতে গেলাম। তখন তিনি বাড়ি বদল করেছেন। ব্রিটিশ কাউন্সিলের বাঁদিকের চোঙাঅলা দোতলা বাড়িটিতে উঠে এসেছেন। (বর্তমানে বাড়িটি ভেঙে ফেলা হয়েছে।) প্রফেসর রাজ্জাকের সঙ্গে বসবাস করছেন তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা-ভ্রাতৃবধূ এবং তাঁদের ছেলেমেয়েরা। শুধু বাড়ি-বদল নয়, অনেক কিছুরই পরিবর্তন ঘটে গেছে। প্রফেসর রাজ্জাক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করতে আরম্ভ করেছেন। তা ছাড়া তাঁকে জাতীয় অধ্যাপকও বানানো হয়েছে। পূর্বতন চেয়ারম্যান ড. মোজাফফর আহমদ চৌধুরী উপাচার্যের পদে আসীন হয়েছেন। মোজাফফর সাহেব ছিলেন প্রফেসর রাজ্জাকের একান্ত স্নেহভাজন ছাত্র।

রাজ্জাক সাহেবের চেহারার মধ্যেও একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখতে পেলাম। তাঁর থুতনিতে একগোছা দাড়ি এই সময়ের মধ্যে গজিয়ে গেছে। এই নতুন জন্মানো দাড়ির গোছাটি তাঁর মুখের আদল একেবারে সম্পূর্ণরূপে বদলে দিয়েছে। পাঞ্জাবি পাজামার পরিবর্তে তিনি যদি কলারহীন লম্বা শার্ট এবং প্যান্ট পরতেন, অবিকল ভিয়েতনামের হোচি মিন বলে চালিয়ে দেয়া যেতো। বাস্তবিকই নতুন জন্মানো শ্মশ্রুর গোছাটিতে তাঁর মুখের রেখাগুলো অনেক ধারালো দেখায়। তিনি জানালেন, মুক্তিযুদ্ধের এই নয় মাস তাঁকে কেরানিগঞ্জের নানা জায়গায় পালিয়ে বেড়াতে হয়েছিলো এবং এই সময়ের মধ্যে তিনি দাড়ির গোছাটি এক রকম বিনা পরিচর্যায় গজিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

আমাকে কেউ-কেউ বলেছেন, এই চোঙাঅলা বাড়িতে একসময় কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার বসবাস করে গেছেন। সত্য মিথ্যা পরখ করে দেখার সুযোগ হয়নি। সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় যখন উঠেছি ছাঁৎ করে বুদ্ধদেব বসুর একটা গল্পের কথা মনে এল। গল্পটির নাম সবিতা দেবী। মোহিতবাবু ছিলেন তরুণ লেখক-কবিদের ওপর ভীষণ খড়্গহস্ত। সুযোগ পেলেই নানাভাবে নাজেহাল করতেন। তরুণরাও মজুমদার মশায়ের ওপর বদলা নিতেন। বুদ্ধদেব বসু মোহিতলাল মজুমদারকে নিয়ে এই শ্লেষাত্মক গল্পটি লিখেছিলেন, তা নাও হতে পারে। কিন্তু আমার মনে মোহিতলাল মজুমদারের ছবিটি ভেসে উঠেছিলো। গল্পটির এক জায়গায় আছে, গল্পের নায়িকা সবিতা দেবীকে এক বৃষ্টির দিনে রচনা পাঠ করে শোনাতে গিয়েছিলেন। ঘরে প্রবেশ করার আগে ছাতাটি সিঁড়ির কাছে রেখে গিয়েছিলেন। সেই ছত্রনিঃসৃত একটি

জলের রেখা এঁকেবেঁকে সিঁড়ির ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিলো। প্রফেসর রাজ্জাকের বাড়ির সিঁড়ি ভাঙতে গিয়ে সেই জলের রেখাটি শুষ্ক ফেব্রুয়ারি মাসেও আমার মনে ছলছলিয়ে জেগে উঠেছিলো। এর সবটাই হয়তো কল্পনা। হয়তো বুদ্ধদেব বসু মোহিতলালকে উপলক্ষ করে গল্পটি লেখেননি। যে সিঁড়ির কথা বুদ্ধদেব বলেছেন, সেটা তাঁর কল্পনাতেই জন্ম নিয়েছিল। এটা সে সিঁড়ি নয়। মানুষের মন ভারি বিদঘুটে জিনিস। কত অসম্ভব বস্তুর কল্পনা করে।

আমি যখন সিঁড়ি ভেঙে রাজ্জাক সাহেবের ঘরে গেলাম, দেখি তিনি একখানি কাঁথা গায়ে দিয়ে গুড় ক গুড় ক হুঁকা টানছেন। আমাকে দেখামাত্রই তাঁর মুখমণ্ডল ভেদ করে একটা সুন্দর হাসি বিকশিত হয়ে উঠলো। আরে মৌলবি আহমদ ছফা যে! আয়েন, আয়েন, তাইলে বাঁইচ্যা আছেন। আত্মীয়স্বজন সকলের কী দশা?

আমি বললাম, সকলে বেঁচে আছেন।

আপনি কই আছিলেন?

আমি বললাম পুরো সময়টা আমি ভারতে কাটিয়েছি।

তিনি ফের জিগ্‌গেস করলেন, দেশের বাড়িতে যাইয়া খবরটবর নিছেন?

আমি জবাব দিলাম, ঢাকা এসেই বাড়িতে চলে গিয়েছিলাম। সপ্তাহখানেক আগে ফিরে এসেছি।

আপনের বাড়িতে কে কে আছে?

মা, ভায়ের ছেলেমেয়ে এবং ভাবি। বোনদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে।

এই সময়ে ছোটো একটি বাচ্চা এসে খবর দিল নাস্তা দেয়া হয়েছে। রাজ্জাক সাহেব আমাকে বললেন, আয়েন মৌলবি আহমদ ছফা, আমাগো লগে সামান্য নাস্তা করেন।

আমি বললাম, স্যার, হল কেন্টিনে গিয়ে নাস্তা করবো।

তিনি বললেন, আমাগো লগে সামান্য কিছু মুখে দেন, তারপর যদি পেটে ক্ষিধা থাকে ঘরে যাইয়া আবার খাইয়েন।

পাশের রুমে গিয়ে দেখি বিরাট এক টেবিলের চারপাশে চেয়ার পাতা হয়েছে। পরিবারের সকলে জড়ো হয়েছেন। রাজ্জাক স্যারের ছোটো ভাই, তাঁর বেগম, দুই কন্যা, ছেলেরা। একজন অতিথিও ছিলেন। উনাকে রাজ্জাক স্যার মামা ডাকতেন। একটা বড় চীনামাটির প্লেটে চৌকোণা সাইজের পুরু পরোটার স্তূপ। ভুনা গরুর মাংস। চিতই পিঠের সঙ্গে গাঁথা ভাজা ইলিশের টুকরা। ফালি ফালি করে কাটা পনির। ডিম ভাজা। ভাজা রূপচান্দা শুঁটকি। একপাশে গরম করা গতরাতের বাসি ভাত। আরেকটা বাটিতে দেখলাম খুদভাত। রাজ্জাক

স্যার বাসি ভাতের প্লেট থেকে চামচ দিয়ে ভাত তুলে নিলেন। তারপর ভাতের সঙ্গে কিছু তাজা মুড়ি মাখিয়ে নিলেন। সেদিনই প্রথম জানতে পারি, ঢাকা জেলার কেরানিগঞ্জ এলাকার মানুষ ভাতের সঙ্গে মুড়ি মাখিয়ে তৃপ্তিসহকারে ভোজন করে থাকে। রাজ্জাক স্যার বাসি ভাতের সঙ্গে শুঁটকি ভাজা দিয়ে শুরু করলেন। ছোটোদের আকর্ষণ দেখলাম খুদভাতের দিকে। আমাদের চট্টগ্রামেও মানুষ খুদভাত খেয়ে থাকে। তবে যারা খায় তারা অত্যন্ত গরিব, চাল কেনার ক্ষমতা যাদের নেই। প্রথম দিনেই আমি অনুভব করলাম, রাজ্জাক স্যারের বাড়িতে খাওয়াটা একটা রীতিমতো পারিবারিক উৎসব। আর খাদ্যবস্তু শিল্পকলায় পরিণত হয়েছে।

সকালের নাস্তার পর রাজ্জাক স্যার তামাক টানতে টানতে বললেন, এখন আপনের কিছু কথাবার্তা কন।

আমি আমার গবেষণার কথাটি তুললাম। তিনি আমার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, আপনে তো লেখালেখি করেন।

আমি বললাম, এ পর্যন্ত আমার চারটি বই বেরিয়েছে।

তিনি বললেন, পরের বার আওনের সময় লইয়া আয়েন। দেখি কী লিখেন।

তার পরের দিনই আমার লেখা চারটা বইয়ের কপি নিয়ে হাজির হলাম। তিনি বললেন, আমি ত এখন বাজারে যাইবার লাগছি। শেলফের একটা কোণা দেখিয়ে বললেন, ওইহানে রাইখ্যা যান। কাইল আবার আয়েন। একটু দেরি কইর‍্যা আইবেন। বাজার থেইক্যা আওনের পর অইলে ভালা। কিছুক্ষণ কথাবার্তা কওন যাইব।

তার পরদিন গিয়ে দেখি সবে তিনি বাজার থেকে ফিরে এসেছেন। দুটি বিরাট ঝুড়িভরতি বাজারের সওদা। মাছ, মাংস, তরিতরকারি একে একে ভ্রাতৃবধূর হাতে তুলে দিচ্ছেন। আমাকে দেখে একটু হাসলেন এবং জিগ্‌গেস করলেন, মৌলবি আহমদ ছফা, আপনে কখনো মৌলবিবাজার গেছেন?

আমি বললাম, গিয়েছি।

তিনি ফের জানতে চাইলেন, কখনো কাঁচাবাজারে গেছেন?

আমি না–সূচক মাথা নাড়লাম।

তিনি বললেন, একটা কথা খেয়াল রাখন খুব দরকার। যখন কোনো নতুন জায়গায় যাইবেন, দুইটা বিষয় পয়লা জানার চেষ্টা করবেন। ওই জায়গার মানুষ কী খায়। আর পড়ালেখা কী করে। কাঁচাবাজারে যাইবেন, কী খায় এইডা দেখনের লাইগ্যা। আর বইয়ের দোকানে যাইবেন পড়াশোনা কী করে হেইডা জাননের লাইগ্যা। আমি একবার তুরস্কের বইয়ের দোকানে যাইয়া

দেখলাম, বামপন্থী বই আর ধর্মীয় বইপত্র সব দোকানে সাজাইয়া রাখছে। বইয়ের দোকান পরখ করলেই বেবাক সমাজটা কোনদিকে যাইতাছে, হেইডা টের পাওন যায়। আরেকবার কায়রো গিয়া দেখলাম, নীলনদের পাড়ে মজুরশ্রেণীর মানুষেরা বড় বড় গামলা ভরতি কইর‍্যা বরবটি জাতীয় ভেজিট্যাবল আরাম কইরা খাইতাছে। মোটাসোটা মানুষ। খাওনের পরিমাণটাও তেমন। কী খায়, কী পড়ে এই দুইডা জিনিস না জানলে একটা জাতির কোনো কিছু জানন যায় না।

তিনি বাজার থেকে সবে এসেছেন, এখনও পায়ে প্যাঁক কাদা লেগে রয়েছে। পরনের লুঙ্গিটায়ও কাদার ছিটে লেগেছে। তিনি বললেন, মৌলবি আহমদ ছফা আপনে একটু বয়েন। আমার সারা গা কুটকুট করতাছে। একটু ধুইয়া আহি। বাথরুমে গিয়ে গোসল সেরে খদ্দরের সাদা পাজামা এবং খয়েরি পাঞ্জাবি পরলেন। শরীরটা ভালো করে মোছা হয়নি বলে গোছা দাড়ি থেকে দুএক ফোঁটা পানি ঝরে পড়ছে। চাদর দিয়ে মুছে নিয়ে গুড়গুড়িতে টান দিয়ে বললেন, মৌলবি আহমদ ছফা, ওই যে আপনার বই। তিনি বড় টেবিলটা দেখিয়ে দিলেন। আমি আমার চারটি বই দেখতে পেলাম। তিনি ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, একটা কথা মনে রাখন খুব জরুরি। এই যে হবস তাঁর লেভিয়াথান বইতে তিনটা শব্দ 'ন্যাস্টি', 'ব্রুটিশ' এবং 'শর্ট' যেভাবে যে অর্থে ব্যবহার করেছেন, তার বদলে বেবাক ডিকশনারি খুঁইজ্যাও আপনে কোনো শব্দ পাইবেন না। যখন গদ্য লিখবেন এই কথাটি সবসময় মনে রাইখেন। আমার বুঝতে বাকি রইলো না, আমার বইতে যে দীর্ঘ আবেগসর্বস্ব বাক্য আমি লিখেছি, সেদিকে তিনি ইঙ্গিত করছেন। আমি ভীষণ শরমিন্দা হয়ে পড়লাম।

ছোটো যে বাচ্চাটা তামাক সেজে দিতো, চা এনে দিতো, নামটি এখন ভুলে গেছি। বাচ্চাটিকে ডেকে বললেন, এই, দুই পেয়ালা চা দিয়া যা। তিনি এক কাপ নিজে নিলেন এবং আরেক কাপ আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। মৌলবি আহমদ ছফা চা খান। চুমুক দিতে দিতে বললেন, সবসময় লেবু দিয়া চা খাইবেন, চায়ে যে দোষ আছে বেবাক এক্কেরে কাইট্যা যাইব। আমি ত সারাদিন চা খাইয়া টিক্যা আছি। চা শেষ করার পর বললেন, আপনে জসীমুদ্দীনের লেখাটেখা পড়েন। জসীমুদ্দীন শব্দটা উচ্চারণ করার সময়ে 'স'টা 'ছ'এর মতো উচ্চারণ করতেন। আমি জবাব দিলাম, এক সময়ে জসীমুদ্দীন সাহেবের লেখা পড়তাম। এখন আর কোনো আগ্রহ বোধ করিনে।

রাজ্জাক স্যার বললেন, আমি জসীমুদ্দীনের লেখা খুব পছন্দ করি। আপনি কি তাঁর আত্মজীবনী পড়েছেন?

আমি বললাম, 'জীবন কথা'র কথা বলছেন স্যার? পড়েছি।

গদ্যটি কেমন?

খুব সুন্দর।

রাজ্জাক সাহেব বললেন, এরকম রচনা সচরাচর দেখা যায় না। তারপর তিনি হুঁকো টানতে টানতে জসীমুদ্দীনের গল্প বলতে আরম্ভ করলেন। একসময় কলকাতায় আমি এবং জসীমুদ্দীন এক বাড়িতে থাকতাম। একদিন জসীমুদ্দীন আমাকে কাপড়চোপড় পইর‍্যা তাড়াতাড়ি তৈয়ার অইবার তাগাদা দিতে লাগলেন। আমি জিগাইলাম, কই যাইবার চান। জসীমুদ্দীন কইলেন, এক জায়গায় যাওন লাগব। কাপড়চোপড় পইর‍্যা তার লগে হাঁইট্যা হাঁইট্যা যখন এ্যাসপ্ল্যানেডে আইলাম, জসীমুদ্দীন ঘাড় চুলকাইয়া কইলেন, কও দেখি এখন কই যাওন যায়? এইরকম কাণ্ড অনেকবার অইছে। একটুখানি হাসলেন।

কবি জসীমুদ্দীনের প্রসঙ্গ ধরে কবি মোহিতলালের কথা উঠলো। মোহিতলাল মজুমদার পূর্ববাংলার উচ্চারণরীতিটি বরদাশত করতে পারতেন না। কবি জসীমুদ্দীনের একটি কবিতার বইয়ের নাম ছিল ধান খেত। মোহিতবাবু ব্যঙ্গ করে বলতেন জসীমুদ্দীন ধান খেতো। মোহিতলালের জিভের মধ্যে বিষ আছিল। তাঁর ঠাট্টা রসিকতা এমনভাবে ছড়াইয়া পড়ল জসীমুদ্দীন বেচারার জান যাওনের দশা। একবার আমি মোহিতবাবুরে চ্যালেঞ্জ কইর‍্যা বইলাম। কইলাম, আপনে জসীমুদ্দীনরে এত ঠাট্টা করেন ক্যান্। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যদি জসীমুদ্দীনের উপর এক অধ্যায় লেখা অয়, আপনেরে নিয়া লেখব মাত্র চাইর লাইন। এরপরে রাজ্জাক সাহেব একটি সাম্প্রতিক প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন। দ্যাহেন বাংলাদেশ সরকার জসীমুদ্দীনরে কিছু করল না। আমারে আর জয়নুল আবেদিন সাহেবরে মুশকিলে ফেলাইয়া দিছে। আমগো দুইজনেরে ন্যাশনাল প্রফেসর বানাইছে, আর জসীমুদ্দীনরে কিছু বানায় নাই।

আলোচনার একটা পর্যায়ে কাজী নজরুল ইসলামে এসে ঠেকলো। তিনি কীভাবে নজরুলের রচনার সঙ্গে পরিচিত হন, সেই কাহিনী বয়ান করলেন। রাজ্জাক স্যার যা বলছিলেন তার সবটুকু আমি ভুলে বসে আছি। শুধু এটুকু মনে আছে, নজরুলকে ঢাকার জলসায় তিনি গান গাইতে দেখেছেন। এটাও জানালেন, নজরুল ইসলাম এবং দ্বিজেন্দ্রলাল তনয় দীলিপ রায়ের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতার ভাব ছিলো। রাজ্জাক সাহেব জানালেন, কলকাতায় তাঁরা যেখানে থাকতেন, সে জায়গাটা কাননবালার বাড়ির খুব কাছাকাছি ছিল। কাননের বাড়িতে নজরুল ইসলাম পড়ে থাকতেন। উস্তাদ জমীরুদ্দিন এবং

কাজী নজরুল ইসলাম মিলে সুরের নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষা করতেন। কোথাও আড্ডায় মজে গেলে নজরুল ইসলামের দিন রাত খেয়াল থাকতো না। মাঝে মাঝে নজরুলের শাশুড়ি গিরিবালা দেবী এসে কাননের বাড়ি থেকে নজরুলকে ধরে নিয়ে যেতেন।

কাজী নজরুল ইসলামের প্রসঙ্গ উঠলে রাজ্জাক স্যার শিশুর মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন। নজরুলের জন্য তাঁর প্রাণে এক গভীর ভালোবাসা সঞ্চিত ছিলো। তিনি প্রায়ই বলতেন, বৈষ্ণব কবিদের পর কোনো গীতিকারই নজরুলের মতো জনচিত্তে অমন আসন লাভ করতে পারেনি। তিনি প্রেমেন মিত্তিরের একটা কবিতার লাইন আবৃত্তি করলেন, বজ্র, বিদ্যুৎ আর ফুল এই তিনে নজরুল।

রাজ্জাক স্যারের কথা শুনতে শুনতে অনেক বেলা হয়ে গেলো। এরই মধ্যে ক'জন প্রবীণ ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। এঁদের কাউকে আমি চিনি না। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তিনি বিলেতের গল্প করতে আরম্ভ করলেন। বিলেতের কথা উঠতেই খাওয়াদাওয়ার প্রসঙ্গ উঠলো, রাজ্জাক স্যার বললেন, ইহুদিদের মাংসের দোকানের বেশির ভাগ ক্রেতা মুসলমান। ইহুদিরাও মুসলমানের মতো আড়াই পোঁচ দিয়া পশু জবাই করে। তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা উল্লেখ করে বললেন, আমি জবাই করা গোশতের খোঁজ করবার লাগছিলাম, এক ইহুদি কসাইর দোকানে যাইয়া হাজির অইলাম। আমারে এক নজর দেইখ্যাই হে কইয়া বসলো, আপনে কি খুঁজতাছেন আমি টের পাইছি। আয়েন জবাই করা মাংস নিয়া যান। তারপর থেইক্যা হের কাছ থেকে গোশত কিনা শুরু করলাম। এই প্রবীণ ভদ্রলোকেরা যখন বিদায় হলেন বেলা প্রায় একটা বাজে। রাজ্জাক স্যার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মৌলবি আহমদ ছফা, দুপুরের খাবারটাও খাইয়া যান।

চার

প্রায় দশদিন পরে আবার রাজ্জাক স্যারের বাড়িতে গেলাম। একটু দেরি করেই গেলাম। যদি সকালে যাই, আমাকে নাস্তা খেতে ডাকবেন। আমি এড়াতে পারবো না। উনার বাড়িতে রোজ রোজ খেয়ে যদি উপাদেয় খাবারে রসনা

অভ্যস্ত হয়ে যায়, ইন্টারন্যাশনাল হোস্টেলে ফজলুর নাস্তা আমার জিভে রুচবে না। স্যারের বাড়িতে গিয়ে দেখি, আধছেঁড়া গেঞ্জিটার ওপর খদ্দরের চাদর চাপিয়ে দাবার বোর্ডের সামনে বসে আছেন। বিপরীতে নিয়াজ মানে নিয়াজ মোর্শেদ। একালের গ্র্যান্ডমাস্টার। তখনও নিয়াজ একেবারে বাচ্চা। বোধহয় স্কুলও শেষ করেনি। নিয়াজকে একজন দক্ষ দাবারু হিসেবে গড়ে তুলতে রাজ্জাক স্যার অনেক কিছু করেছেন, মায় পারিবারিক বিপর্যয় সামাল দেয়া পর্যন্ত। দেখলাম, রাজ্জাক স্যার এবং নিয়াজ দাবা খেলার টেকনিক, ফন্দিফিকির নিয়ে গভীর আলাপ করছেন। নানারকম চাল বোর্ডে দিয়ে বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছেন।

আমাকে দেখে স্যার সেই পুরোনো হাসি হেসে বললেন, মৌলবি আহমদ ছফা বয়েন। আমি বসেই রইলাম। তিনি নিয়াজের সঙ্গে দাবা নিয়ে মত্ত হয়ে রইলেন। ঘড়ির কাঁটা নটার ঘর থেকে দশটার ঘরে এসেছে। বসে বসে আমার পায়ে ঝিম ধরার উপক্রম। আমি উঠে গিয়ে শেলফে বই দেখতে থাকলাম। সমাজবিজ্ঞান, রাজনীতি, ইতিহাস, রাষ্ট্রতত্ত্ব ইত্যাকার নানা বিষয়ের গম্ভীর মলাটের বই। আমার মনে হল এগুলোতে দাঁত বসাবার ক্ষমতা আমার জন্মায়নি। খোঁজাখুঁজি করতে করতে শেলফের একটা তাকে ফরাসি সাহিত্যের কিছু বইয়ের সন্ধান পেয়ে গেলাম। বালজাকের রচনাবলী, ফ্লবেয়ারের উপন্যাস, মোপাসাঁর রচনা, ভিকটর হুগোর বই—ফরাসি সাহিত্যের এতোগুলো প্রধান লেখকের বই একসঙ্গে আমি কোথাও দেখিনি। আমার হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেলো। ইচ্ছে হল বালজাকের রচনার প্রথম খণ্ড এখুনি ধার চেয়ে বসি। যদি ধার দিতে তিনি অস্বীকৃত হন, লাইব্রেরিতে বসে পড়ার অনুমতি প্রার্থনা করি। কিন্তু আগ্রহটা চেপে গেলাম।

বেলা এগারোটার দিকে নিয়াজ গাত্রোত্থান করলো। রাজ্জাক স্যার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মৌলবি আহমদ ছফা চইল্যা যান নাই? আমি হাসতে চেষ্টা করলাম। স্যার টেবিলে পা দুটো উঠিয়ে দিয়ে যুৎ হয়ে বসলেন, আপনে এখন কী পড়াশোনা করবার লাগছেন।

আমি বললাম, কীভাবে শুরু করবো বুঝতে পারছি না। আপনি যদি কিছু বইয়ের নাম বলে দিতেন।

স্যার শব্দ করেই হেসে উঠলেন। একই কথা মিঃ হ্যারল্ড লাস্কিরে কইছিলাম, তিনি লাইব্রেরি দেখিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, মাই বয় গো অ্যান্ড সোক।

আমি সঠিক অর্থটা বের করতে পারছিলাম না। লাইব্রেরিতে গো করা যায়, কিন্তু সোক কী করে সম্ভব। লাইব্রেরি তো গোসলখানা নয়। মনে হল, আমার কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থাটা স্যার বুঝতে পারলেন। তিনি বললেন, প্রথম লাইব্রেরিতে ঢুইক্যাই আপনার টপিকের কাছাকাছি যে যে বই পাওন যায় পয়লা একচোটে পইড়া ফেলাইবেন। তারপর একটা সময় আইব আপনে নিজেই খুঁইজ্যা পাইবেন আপনের আগাইবার পথ। রাজ্জাক স্যার অগ্রসর হওয়ার রাজপথটা সেদিন এমনি করে চোখে আঙুল দিয়ে যদি দেখিয়ে না দিতেন হয়তো আমার আরব্ধ গবেষণাকর্মটি আমি একভাবে–না–একভাবে শেষ করতে পারতাম।

সেসব কথা থাকুক। স্যার হুঁকো টানতে টানতে অনুচ্চস্বরে কথা বলতে থাকলেন। খুব মনোযোগ দিয়ে না শুনলে তাঁর উচ্চারিত বাক্য অনুধাবন করা যায় না। তিনি বললেন, বুঝলেন, মৌলবি আহমদ ছফা, লেখার ব্যাপারটি অইল পুকুরে ঢিল ছোড়ার মতো ব্যাপার। যতো বড় ঢিল যতো জোরে ছুড়বেন পাঠকের মনে তরঙ্গটাও তত জোরে উঠব এবং অধিকক্ষণ থাকব। আর পড়ার কাজটি অইল অন্য রকম। আপনে যখন মনে করলেন, কোনো বই পইড়্যা ফেলাইলেন, নিজেরে জিগাইবেন যে–বইটা পড়ছেন, নিজের ভাষায় বইটা আবার লিখতে পারবেন কি না। আপনের ভাষার জোর লেখকের মতো শক্তিশালী না অইতে পারে, আপনের শব্দভাণ্ডার সামান্য অইতে পারে, তথাপি যদি মনেমনে আসল জিনিসটা রিপ্রোডিউস না করবার পারেন, ধইর‍্যা নিবেন, আপনের পড়া অয় নাই।

মাঝখানে এক সপ্তাহ বিরতি দিলাম। পরবর্তী সপ্তাহে পরপর তিনদিন গেলাম। কোনোদিনই স্যারকে একা পেলাম না। নানান ধরনের মানুষ স্যারের কাছে আসছে তো আসছেই। কেউ আসছেন নতুন প্রকাশিত বই স্যারকে উপহার দিতে। কেউ দেশের বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার আগে কীভাবে পড়াশোনা করবেন, স্যারের কাছে পরামর্শের জন্য। কেউ এসেছেন চাকুরির তদবির করতে। এমনকী এক ভদ্রমহিলাকে মৃদুস্বরে তাঁর মেয়ের বিয়ে এবং তাঁর নিজের খরচ মেটাবার অক্ষমতা প্রকাশ করতে শুনলাম। স্যার খুব অল্প কথায় জবাব দিলেন। চাকুরিপ্রার্থী ভদ্রলোককে জানালেন, আইচ্ছা ঠিক আছে আমি অমুকরে বইল্যা দিমুনে। হে যদি কথা না শুনে করনের কিছু নাই। ভদ্রমহিলাকে বললেন, আপনে দুই সপ্তাহ পর একবার আয়েন দেহি।

দ্বিতীয় দিনে গিয়ে দেখলাম রাজ্জাক স্যার স্যুট টাই পরা ফরসাপনা উঁচা লম্বা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে শেকসপীয়রের নাটক নিয়ে আলোচনা করছেন।

কথায়-কথায় স্যার জানালেন, মার্চেন্ট অভ ভেনিসের শাইলকের সেই উক্তিটি আপনের মনে পড়ে কি না। ভদ্রলোক বললেন, কোনটা স্যার? আদালতে যখন শাইলককে শাস্তি দিবার ভয় দেখাইতেছিল, শাইলক জবাবে কইছিল, এ জ্যু'স ব্লাড ইজ অলসো রেড। এইখানেই শেকসপীয়রের আসল প্রতিভা ফুইট্যা বাইর অইছে। শেকসপীয়র ষোড়শ শতাব্দীর মানুষ। সেই সময় ইউরোপে ইহুদিগো কী অবস্থা ভাইব্যা দেখেন। ইউরোপের দেশে দেশে ইহুদিগো উপর যে ধরনের জুলুম অইতাছিল, হেইড়ারে হিটলারের অত্যাচারের চাইতে কিছুতে কম বলা যাইব না। এইরকম একটা সময়ে শেকসপীয়র মাত্র কলমের একটা টানে তামাম ইহুদিরে মনুষ্যসমাজের অংশ বইল্যা প্রমাণ করলেন, চিন্তা কইর‍্যা দেখেন কী অসম্ভব ব্যাপার। অঘটনঘটনপটিয়সী প্রতিভা বইলাই শেকসপীয়রের পক্ষে ওইটা সম্ভব অইছিল। বেবাক মধ্যযুগ তালাশ কইর‍্যা দেখলেও এইরকম বিদ্যুতের মতন ঝলক-দেওয়া একটা লাইন আপনে খুঁইজ্যা পাইবেন না।

তৃতীয় দিনে দেখলাম এক খ্যাতনামা ইতিহাসের অধ্যাপকের সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁ নিয়ে আলাপ করছেন। ভদ্রলোক বেঙ্গল রেনেসাঁ যে এই অঞ্চলের ইতিহাসে খুব বড় একটা ঘটনা প্রমাণ করার জন্য অনেক কথা বলেছিলেন। রাজ্জাক স্যারকে ওই অধ্যাপকের জবাবে বলতে শুনলাম, আপনেরা নাইন্টিনথ সেঞ্চুরিকে গ্লোরিফাই করার জন্য যত কথাই বলেন না কেন, বেশি দূর নিয়া যাওন, আপনেগো সম্ভব অইব না। যখন সিপাহি বিদ্রোহ চলছিল আপনেগো তথাকথিত মহাপুরুষেরা কোন ভূমিকা পালন করেছিলেন, মনেমনে কমপেয়ার কইর‍্যা দেখলে নিজেই জবাব পাইয়া যাইবেন। আধুনিক বাংলা গদ্যের বিকাশই অইল নাইন্টিনথ সেঞ্চুরির সবচাইতে মূল্যবান অবদান।

আপনেরা রামমোহনরে এক্কেরে আকাশে তুইল্যা ফেলাইছেন। তার লগে মীর সওদার তুলনা করলে ফারাকটা বুঝতে পারবেন। মীর সওদারে উর্দু গদ্যের একজন জনক কওন যায়। মীর আর রামমোহন দুইজন কন্টেম্পরারি। একবার অযোধ্যার নবাব বাজার দেখবার গেছিলেন। বাজারের সমস্ত মানুষ নবাব সাবরে তাজিম দেহাইয়া বাঁচে না। সওদা তখন এক দোকানে বইয়া হুঁকা খাইতে আছিল, তারে যখন জানানো অইল নবাব সাব আইছে, আপনে তাজিম দেখাইতে আসেন। সওদা জবাব দিছিল, মাইভি উর্দু জবান কা নওয়াব হ্যায়। মগর কৌন পুঁছে? দুইজনের পার্সোনালিটি কম্পেয়ার কইর‍্যা দেখেন। রামমোহনরে বিলাত পাঠানোর সময় রাজা টাইটেল দিলেন বাহাদুর শাহ। কিন্তু বাহাদুর শাহরই কোনো রাজত্ব আছিল না। রামমোহন হেই টাইটেল গোটা জীবন আগলাইয়া রাখলেন।

ডিগবির দেওয়ান হিসাবে ত রামমোহন তার নতুন ক্যারিয়ার শুরু করলেন। ঘুষ খাওন থেইক্যা শুরু কইর‍্যা তার গুণের অন্ত আছিল না। রামমোহনের যদি আসল কীর্তির কথা বলবার চান, অবশ্যই তার বাংলা গদ্য লেখার কথাটি স্বীকার করতে অইব। তার ত যোগ্যতা আছিল অঢেল। ইচ্ছা করলেই আরবি, উর্দু, ফারসি, সংস্কৃত ইংরিজি সব ভাষাতেই লিখতে পারতেন। এক্ষেত্রে ডাইনে বামে না তাকাইয়া হি চুজ টু রাইট ইন বেঙ্গলি, এইডাই তার বড় কাজ। গৌড়ীয় বাংলা ব্যাকরণই অইল তার বড় অবদান। আপনেরা তার ধর্মপ্রচার এই সকল লইয়া বাড়াবাড়ি করেন। ভারতবর্ষে রামমোহনের মতো ধর্মপ্রচারক রামমোহনের আগে অনেকেই ছিলেন। রামমোহন অইল সেই ধারার শেষ মানুষ। এইডারে বড় কইর‍্যা দেখন ঠিক না। এন্টায়ার নাইন্টিনথ সেঞ্চুরির মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অইল সর্বাংশে একজন বড় মানুষ। বাইফার হি ইজ দ্যা বেস্ট।

এই তিনদিন নানা মানুষের সঙ্গে রাজ্জাক স্যারের যেসব কথাবার্তা হল, শুনে আমার মনে হল তাঁর বাক্য থেকে ঠিকরে মণিমুক্তো বেরিয়ে আসে। অতি সামান্য কথায়ও এমন তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়, বিস্ময়ে অভিভূত না হয়ে পারা যায় না। তাজমহলকে সামনে থেকে, পেছন থেকে, ডাইনে থেকে, বাঁয়ে থেকে যেদিক থেকেই দেখা হোক না কেনো দর্শকের দৃষ্টিতে ক্লান্তি আসে না, আরও দেখার পিপাসা জাগে। আমি রাজ্জাক সাহেবকে মনেমনে তাজমহলের সঙ্গেই তুলনা করতে থাকলাম। তাঁর ব্যক্তিত্বের এমন একটা সুন্দর সম্মোহন রয়েছে, তার আকর্ষণ এড়ানো আমার পক্ষে অসম্ভব। ইন্টেলেকচুয়াল বিউটি তথা মনীষার কান্তি কী জিনিস আমাদের সমাজে তার সন্ধান সচরাচর পাওয়া যায় না। রাজ্জাক সাহেবের প্রতি প্রাণের গভীরে যে একটা নিষ্কাম টান অনুভব করেছি, ও দিয়েই অনুভব করতে চেষ্টা করি এথেন্স নগরীর তরুণেরা দলেদলে কোন্ অমৃতের আকর্ষণে সক্রেটিসের কাছে ছুটে যেতো।

পরের সপ্তাহে প্রায় প্রতিদিন সকালবেলা স্যারের ওখানে গিয়েছি। শেকসপীয়র বলেছেন, ফ্যামিলিয়ারিটি ব্রীডস কনটেম্পট—অতিপরিচয়ে সুন্দর সম্পর্কও মলিন হয়ে যায়। প্রত্যহের পরুষ স্পর্শে অত্যন্ত হার্দ্য সম্পর্কের মধ্যেও ময়লা জমতে থাকে। রাজ্জাক স্যার সম্পর্কে আমার পূর্বের ধারণারও ঈষৎ পরিবর্তন করতে বাধ্য হলাম। রাজ্জাক সাহেব তাজমহল ঠিকই, তবে তাতে কোনো দরোজা জানলা নেই। থাকলেও তাতে কোনো ছিটকিনি নেই। এদিকের হাওয়া ঢুকে ওদিক দিয়ে চলে যায়। ওদিকের হাওয়া এদিকে। ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন বার্নার্ড শ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, এ গুড ম্যান এ্যামাং দ্যা ফেবিয়ানস। রাজ্জাক সাহেবের অবস্থাও অনেকটা সেরকম।

তাঁর কাছে খুব বেশি মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিক তৃষ্ণার টানে আসেন না। তাঁদের প্রায় সকলেরই একটা–না–একটা ধান্ধা থাকে। কারও চাকুরির উন্নতি, কারও অন্যবিধ তদবির। মতলববাজ মানুষরাই বেশির ভাগ সময় রাজ্জাক সাহেবকে ঘিরে থাকে। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই জিনিসটা স্পষ্ট হবে। কাহিনীটা স্যারের মুখ থেকেই শোনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একসময়ের ডাকসাইটে উপাচার্য আবদুল মতিন চৌধুরী বিলেত থেকে পিএইচডি শেষ করার পর এক সন্ধেবেলা তাঁর ডক্টোরাল থিসিসের একটা কপিসহ স্যারের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। সৌজন্য বিনিময়ের পর চা–নাস্তা খেয়ে চলে গেলেন। ক্লাব থেকে ফেরার পর রাজ্জাক স্যার দেখেন যে ভুলক্রমে চৌধুরী সাহেব তাঁর থিসিসটা ফেলে গেছেন। তিনি তখন মতিন সাহেবকে ফোনে জানালেন। আপনার থিসিস ফেইল্যা গেছেন। মতিন সাহেব জবাবে জানালেন আপনার পড়ার জন্য রেখে এসেছি। রাজ্জাক সাহেব বললেন, আমি ত কিছু বুঝবার পারুম না। মতিন সাহেব বললেন, সেকথা বলবেন না স্যার, আপনি মহাজ্ঞানী, আপনি না বুঝতে পারেন, এমন কোনো জিনিস দুনিয়াতে নেই। তখন রাজ্জাক সাহেবকে হলফ করে বলতে হলো তিনি সত্যি সত্যি কিছু বুঝতে পারবেন না। মতিন চৌধুরী সাহেব তখনই তাঁর সংকল্পটা ব্যক্ত করলেন। আপনি থিসিসটা বুঝতে পারবেন না ঠিকই, কিন্তু সিলেকশন কমিটির দুয়েকজন মেম্বারের কাছে বলে দিতে হবে কাজটা খুব উত্তম হয়েছে।

সেই সময়ে মতিন চৌধুরী সাহেব ছিলেন একজন প্রফেসর পদপ্রার্থী। মতিন সাহেবের হয়ে তিনি অনুরোধ করেছিলেন কি না বলতে পারবো না। তবে যাঁরা তার চারপাশে ঘুরঘুর করতেন, তাঁকে দিয়ে তাঁরা অনেক কাজ করিয়ে নিতেন। এইরকম দীপ্তিমান মনীষাসম্পন্ন একজন ব্যক্তি এই অজস্র বামুন–পরিবেষ্টিত অবস্থায় সকলের মাপে নিজেকে ছোটো করছেন কেনো তার কারণ আমি নিজেকেই বারবার জিগ্‌গেস করেছি। তার কারণ আবিষ্কার করতে অনেক সময় লেগেছে।

পাঁচ

এরই মধ্যে একদিন গিয়ে আমি অত্যন্ত সসঙ্কোচে আমার থিসিসের কথাটা তুললাম। স্যার জানতে চাইলেন, এর মধ্যে লেখাপড়া কদ্দুর করছেন? আমি

কিছু বইয়ের নাম করলাম, যেমন বি. বি. মিশ্রের ইন্ডিয়ান মিডল ক্লাসেস, উইলিয়াম হান্টারের অ্যানালস অব রুরাল বেঙ্গল এজাতীয় আরও কিছু বই। রাজ্জাক স্যার জিগ্গেস করলেন, পড়ার সময় দরকারি অংশ টুইক্যা রাখার অভ্যাসটা করছেন কি না?

আমি চুপ করে রইলাম। তার অর্থ এই যে আমি কোনো নোট রাখিনি।

স্যার মন্তব্য করলেন, তাইলে ত কোনো কামে আইব না। ক্ষেত চষবার সময় জমির আইল বাইন্ধ্যা রাখতে অয়।

তারপর রাজ্জাক স্যার শেলফের লেনিন রচনাবলীর ভেতর থেকে একটা বই টেনে বের করলেন। গায়ের চাদর দিয়ে মলাট মুছে নিয়ে বললেন, আপনেরা তো অখন বিপ্লব টিপ্লব অনেক কথা কইবার লাগছেন। দেখি লেনিন সাহেবের এই বইটা আগাগোড়া পইড়্যা সারসংক্ষেপ কইর‍্যা দেখান।

সেদিন আর বিশেষ কথাবার্তা হলো না। স্যারের কোনো একজন আত্মীয়ের অসুখ, হাসপাতালে যাওয়ার তাড়া ছিলো। আমি লেনিনের ইকোনমিক হিস্টরি অব রাশিয়া বইটি নিয়ে হোস্টেলে ফিরে এলাম। পুরো বই আদ্যোপান্ত পাঠ করে প্রতিটি অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ করতে আমার জান কাবার হওয়ার দশা। ইংরেজি ভাষাতে সে সময়ে আমার দখল ছিলো যৎসামান্য। তা ছাড়া অর্থনৈতিক পরিভাষাগুলোর অর্থ কোনোরকমে বুঝতে পারলেও আমি নিজে সেগুলো ব্যবহার করার পারঙ্গমতা অর্জন করতে পারিনি। তথাপি লেনিনের রাশিয়ার অর্থনীতির ইতিহাসের বিশ্লেষণগুলো পাঠ করে অমি ভীষণ উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিলাম এবং লেনিনের অন্তর্দৃষ্টি আমাকে বিস্ময়াবিষ্ট করে তুলেছিল। একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরার লোভ সামলাতে পারছি না। লেনিন সাহেব দেখিয়েছেন বৃহৎ জোতের জমি চাষের প্রচলন শুরু হওয়ার পরে উন্নত জাতের ঘোড়া জমি চষার কাজে ব্যবহার হওয়ার কারণে উৎকৃষ্ট অশ্ব-প্রজননের ধুম পড়ে যায়। ভালো জাতের ঘোড়ার প্রজননবৃদ্ধির জন্য ঘোড়ার বৈদ্য একটি অর্থনৈতিক শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছে, সেই জিনিসটিও উল্লেখ করতে ভুল করেননি।

রাশিয়ার অর্থনৈতিক ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে রাশিয়াতে কেনো সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করা প্রয়োজন, তার পক্ষে যে নৈতিক যুক্তিগুলো দাঁড় করিয়েছিলেন লেনিন, সেটাকেই গ্রন্থটির আকর্ষণীয় অংশ বলে আমার মনে হয়েছিল। লেনিনের মূল বক্তব্য ছিল এরকম : যান্ত্রিক প্রযুক্তি সম্প্রসারিত হচ্ছে, রাশিয়া তার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারবে না। রাশিয়ার উৎপাদন-ব্যবস্থার মধ্যেও একটি পরিবর্তন আসন্ন হয়ে উঠেছে। রাশিয়া মান্ধাতার আমলের অর্থনীতি ইচ্ছা করলেও টিকিয়ে রাখতে পারবে না।

ইতিহাসে পেছনে ফেরা নেই, যেতে হবে সম্মুখের দিকে। কিন্তু রাশিয়ান সমাজের পরিবর্তনের সূচনাটা কে করবে? পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোতে বুর্জোয়াশ্রেণী নেতৃত্ব দিয়ে সমাজের খোল নলচে দুইই বদলে ফেলেছে। কিন্তু রাশিয়াতে পশ্চিমের মতো কোনো সুগঠিত বুর্জোয়া জন্মায়নি। সামন্তবাদ রাশিয়ান সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এই সামন্ত শাসকদের দৃষ্টি ঐতিহাসিকভাবে পশ্চাৎমুখী। আধুনিক কৃৎকৌশল প্রয়োগ করে সমাজের উৎপাদনব্যবস্থার মধ্যে পরিবর্তন আনার ক্ষমতা তাদের নেই। আর পরিবর্তনসাধনের কাজটা যদি তাদের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়, তারা রাশিয়ার শিল্প কৃষি সর্বত্র পশ্চিম ইউরোপের বুর্জোয়াদের ডেকে আনবে। পশ্চিমা বুর্জোয়ারা তাদের শোষণের নাগপাশ বিস্তার করে ভারত কিংবা এশিয়া আফ্রিকার দেশগুলোর মতো রাশিয়াকেও তাদের উপনিবেশে পরিণত করবে। রাশিয়ার সামন্তরা নিজেদের স্থায়িত্বের জন্য আপনা থেকেই পশ্চিমা বুর্জোয়াদের আগ বাড়িয়ে ডেকে আনবে। এই ধরনের একটা অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে লেনিনের যুক্তি হল, রাশিয়াতে পশ্চিমের তুলনায় খুব অল্পই শিল্পায়ন হয়েছে। শিল্প-শ্রমিকের সংখ্যাও পশ্চিমের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল। তার পরেও লেনিন মনে করেন, শ্রমিকশ্রেণীর হাতেই রাশিয়ার ভবিষ্যৎকে সোপর্দ করতে হবে। যেহেতু শ্রমিকরা যন্ত্রপাতি কলকবজা ব্যবহারের অধিক জ্ঞান রাখে, রাশিয়ার ভাবী শিল্পায়নের দায়িত্বও শ্রমিকশ্রেণীর ওপর ন্যস্ত করতে হবে।

মার্কসের হিসাবমতো গ্রেট ব্রিটেন কিংবা শিল্পসমৃদ্ধ জার্মানিতেই বিপ্লব হওয়ার কথা। মার্কসীয় থিসিস অনুসারে রাশিয়াতে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লব কিছুতেই সম্ভব নয়। লেনিন মার্কসীয় চিন্তা-পদ্ধতিতে একটু অদলবদল ঘটিয়ে রাশিয়াতে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে একটা বিপ্লব সম্পন্ন করার জন্যই রাশিয়ার অর্থনৈতিক ইতিহাসটি লিখেছিলেন।

এই বৃহৎ কলেবরের গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ করতে গিয়ে প্রায় পনেরো দিন দৈনিক ছয় সাত ঘণ্টা করে আমাকে খাটতে হয়েছে। কঠোর পরিশ্রম করে কাজটা শেষ করার পর যখন এক সকালবেলা স্যারকে দেখাতে নিয়ে গেলাম, তিনি বললেন, ওইখানে পিছনের টেবিলে রাইখ্যা যান, সময় অইলে দেখুমনে। তার পরে যেমন বই পড়ছিলেন, পড়তে থাকলেন। আমি একটু দমে গেলাম। এত কষ্ট করে কাজটা করলাম, আমার ধারণা ছিল তিনি দেখামাত্রই কাগজের শিটগুলো আমার হাত থেকে তুলে নিয়ে বলবেন, হায় হায় করছেন কী, এক্কেরে বেবাক বইটা সারসংক্ষেপ কইর‍্যা ফেলাইছেন! সেদিন তিনি এক কাপ চাও খেতে বলেননি। অগত্যা আমাকে মনোবেদনা চেপে গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে হলো।

কিছুদিন ফাঁক দিয়ে আমি আবার স্যারের কাছে গেলাম। তিনি নাস্তা খাওয়ার পর কাগজ পড়ছিলেন। সেই চিরাচরিত হাসিটা ঝিলিক দিয়ে উঠলো। বুঝলাম স্যারের মেজাজ বেশ ফুরফুরে। চোখ থেকে চশমা নামিয়ে বললেন, মৌলবি আহমদ ছফা, লেনিনরে নিয়া বেশ মেহনত করছেন দেখলাম। ইংরিজি না লেইখ্যা বাংলাতে লিখলে পারতেন।

যাক বাঁচা গেল, তিনি আমার সিরিয়াসনেসটা অনুধাবন করতে পেরেছেন, এটাই আমার বড় সান্ত্বনা!

একথা সেকথার পর সমাজতন্ত্রের ভালোমন্দ নিয়ে কথা উঠলো। আমি সরাসরিই একটা প্রশ্ন করে বসলাম। স্যার, সমাজতন্ত্রের কোন জিনিসটা আপনার ভালো লাগে?

তিনি বললেন, কেমনে কই কোন জিনিস ভালা লাগে। তবে আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা কইবার পারি। ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের পরে একজন রাশিয়ান আইছিল ঢাকায়। তখন ত অন্যরকম সময়। একজন রাশিয়ান ভদ্রলোকের লগে মাখামাখি করলে ইন্টিলিজেন্সের কাছে জবাবদিহি করতে অয়, এই ভয়ে অর কাছে কেউ ঘেঁষবার চাইত না। অখন নামটা মনে করবার পারছি না। একসময় ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার বেশ খাতির অইয়া গেল। একসময় তিনি আমাগো লগে থাকতে আইলেন। হেই সময় আমি শান্তিনগর থাকতাম। একদিন দুপুরবেলা ইউনিভার্সিটি থেইক্যা যখন বাড়িতে ফিরবার লইছি সেই ভদ্রলোক আমার লগে আছিল। তখন দুপুরবেলা। খুব গরম। রিকশার বদলির সময়। সহজে রিকশা পাওন যায় না। যেই চড়বার লইছি, সেই ভদ্রলোক আমার হাত ধইর‍্যা টাইন্যা নিয়া কইল, এইটাতে চড়ন যাইত না, দেখছেন না কেমন হাড়জিরজিইর‍্যা মানুষ! আমি যত রিকশা ঠিক করি, একটা একটা অছিলা বাইর কইর‍্যা বিদায় কইর‍্যা দেয়। হেইদিন বেবাক পথটা হাঁইট্যা বাড়িত ফিরতে অইছিল। মেহনতি মানুষের ওপর এই যে জাগ্রত সহানুভূতি আমার মনে অইছে এইডাই সমাজতন্ত্রের সবচাইতে বড় কন্ট্রিবিউশন।

রুশ বিপ্লবের অন্যতম নায়ক ট্রটস্কির প্রতি আমি ভীষণ অনুরক্ত ছিলাম। এই দেশে ট্রটস্কি ভীষণ ঘৃণিত মানুষ। আমার ইচ্ছা হল ট্রটস্কির প্রতি স্যারের মনোভাবটা জেনে নিই। তাই জিগ্গেস করলাম, ট্রটস্কি সম্পর্কে কিছু বলেন।

তিনি স্মিত হেসে বললেন, আমি বিলাত থেইক্কা ফিইর‍্যা ট্রটস্কির 'থিয়োরি অব পার্মানেন্ট রেভ্যুল্যুশনে'র বাংলা তরজমা করছিলাম। তারপর চুরুট ধরিয়ে একটুখানি লাজুক ভঙ্গিতে বললেন, বিলাত থেইক্কা আইস্যা আরও একটা তরজমার কাজ আমি করছিলাম।

আমি আগ্রহসহকারে বললাম, কী কাজ স্যার? অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বাংলার ব্রত’ কইর‍্যা একটা ছোট বই আছে না, হেইডার ইংরিজি অনুবাদ করছিলাম।

রাজ্জাক স্যারের অনুবাদকর্মের কথা শুনে আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম। অধীর আগ্রহে জিগ্গেস করলাম, পাণ্ডুলিপিগুলো কোথায়?

তিনি ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে ডান হাত দিয়ে এমন একটা ভঙ্গি করলেন, দেখে আমার রবীন্দ্রনাথের একটি গানের দুটি পঙ্ক্তি মনে পড়ে গেল। পথিক পরান চলরে ওরে তুই / যে পথ দিয়ে গেছে চলে বিকেলবেলার জুঁই।

এখানে আমি কিছু নিজের কথা বলবো। পরবর্তীকালে রাজ্জাক সাহেব সমাজবিজ্ঞান, রাজনীতি, সাহিত্য, নন্দনতত্ত্ববিষয়ক যেসব কথাবার্তা বলেছেন আমার কাছে, আমি মনেমনে সেগুলোকে অবন ঠাকুরের ‘বাংলার ব্রত’ এবং ট্রটস্কির ‘থিয়োরি অব পার্মানেন্ট রেভ্যুল্যুশন’–এর মধ্যিখানে রেখে একটা গড় করে গ্রহণ করেছি। রাজ্জাক সাহেব সারাজীবনে কিছু লেখেননি কেনো, এই নালিশ আমি সকলের কাছে অহরহ শুনে আসছি। রাজ্জাক সাহেব উল্লেখ করার মতো কিছু লেখেননি কেনো, সে কৈফিয়ত একমাত্র তিনিই দিতে পারেন। তাঁর হয়ে কিছু বলা আমার উচিত হবে না। তথাপি আমি আমার যে ধারণা জন্মেছে, সেটা বলতে পারি। যৌবনে যে মানুষ ট্রটস্কির থিয়োরি অব পার্মানেন্ট রেভ্যুল্যুশনের বাংলা এবং অবন ঠাকুরের ইংরিজি অনুবাদ করেছেন, সেই মানুষের পক্ষে অন্য কোনো মামুলি বিষয়ে কাজ করা অসম্ভব ছিলো। তাঁর মানসিক সূক্ষ্মতার এমন একটা সমুন্নত উত্তরণ ঘটেছিল, সেখান থেকে তৎকালীন বিদ্যাচর্চার স্তরটিতে নেমে আসা সত্যি সত্যি দুরূহ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। জ্ঞানচর্চার সামাজিক প্রেক্ষিতটির কথা অবশ্যই ধর্তব্যের মধ্যে আনতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলা হয়ে থাকে। কেনো এ তুলনাটা করা হয় তার হেতু অদ্যাবধি আমি আবিষ্কার করতে পারিনি। ঘর, বাড়ি, দালান, অট্টালিকা এসকল ভৌত কাঠামোগত কারণে যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অক্সফোর্ডের সঙ্গে তুলনা করা হয়, আমার বলার কিছু থাকে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে কেউ–কেউ ছিলেন, যাঁরা জ্ঞানচর্চার নানা ক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁরা ছিলেন ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোডাক্ট। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেসকল ছাত্র পাশ করেছেন, তাঁরা জ্ঞানচর্চার কোন ক্ষেত্রটিতে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন, সেই জিনিসটি নতুন করে যাচিয়ে দেখা প্রয়োজন। উনিশশো একুশ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চালু হয়েছে। উনিশশো একুশ থেকে সাতচল্লিশ

সালের মধ্যবর্তী সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রও আইসিএস পাশ করেনি। একথা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে বলবার উপায় নেই।

ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের তিনটি প্রধান অবদানের একটি হল পাকিস্তান আন্দোলনের মনস্তাত্ত্বিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ভিতটি তৈরি করা। দ্বিতীয় অবদান বাংলা ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্বদান এবং তৃতীয় অবদান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, সংকল্প ও কর্মপন্থার দিক্‌নির্দেশনা। এই জনগোষ্ঠীর জীবনে ওই তিনটিই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কিন্তু জ্ঞানচর্চার যে আরও একটা বৈশ্বিক মানদণ্ড রয়েছে তাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান বিশেষ কিছু নেই। বিশেষত পাকিস্তান সৃষ্টির পরে জ্ঞানচর্চার উত্তাপ আরও অবসিত হয়েছিলো। পাকিস্তান-সৃষ্টির পরে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতো নিবেদিতপ্রাণ মানুষও নতুন কোনো গবেষণাকর্মে আত্মনিয়োগ করেননি। তিনি বিয়ে পড়ানো এবং মিলাদ শরিফ করে সময় কাটাতেন। জ্ঞানবিজ্ঞান ব্যক্তির সাধনায় বিকশিত হয়, কিন্তু সমাজের মধ্যে জ্ঞানের প্রয়োজন অনুভূত হওয়া চাই। বৃহত্তর অর্থে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনাও বৃহত্তর সমাজপ্রক্রিয়ার একটি অংশ। অনেক সময় উৎকৃষ্ট বীজও পাথরে পড়ে নষ্ট হয়। আমার ধারণা রাজ্জাক সাহেবের ক্ষেত্রেও সেটি ঘটেছিলো। হ্যাঁ, রাজ্জাক সাহেবের যদি চাকুরিবাকুরির ক্ষেত্রে উন্নতি করার আকাঙ্ক্ষা থাকত অবশ্যই তাঁকে লিখতে হতো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা বিষয়ে যে গবেষণা হয়েছে তার বেশিরভাগই চাকুরির প্রমোশনের উদ্দেশ্যে লেখা। রাজ্জাক সাহেবের যদি সে বালাই থাকত লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকসের হ্যারল্ড লাস্কির মৃত্যুর পর তাঁর লেখা থিসিসটা বগলে নিয়ে বিনা ডিগ্রিতে লন্ডন থেকে ফিরে আসতেন না। গোঁড়া ইংরেজ সুপারভাইজারের নির্দেশ মোতাবেক যেন-তেন প্রকারের একটি থিসিস লিখে ডিগ্রিটা অর্জন করতেন। রাজ্জাক সাহেব যদি সংসারধর্ম পালন করতেন, তা হলেও হয়তো জাগতিক উন্নতির প্রয়োজনে তাঁকে কিছু লেখালেখি করতে হতো।

অনেকে, তার মধ্যে রাজ্জাক সাহেবের প্রিয়তম ছাত্রও রয়েছেন, মনে করেন রাজ্জাক সাহেব একজন গোঁড়া মুসলিম লীগ সমর্থক। কিন্তু আমার মূল্যায়ন একটু ভিন্ন রকমের। তাঁর অবস্থান কিছু অংশে মুসলিম লীগ পাটাতনে ছিল একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। তিনি যদি মুসলিম লীগ না করতেন, তাঁকে অবশ্যই কমিউনিস্টদের সঙ্গে যেতে হতো। কিন্তু সেখানেও একটা বড় অসুবিধা ছিলো। কৃষিপ্রশ্নে লেনিন এবং কাউটস্কির মধ্যে যে বিতর্ক হয়েছিলো তাতে রাজ্জাক সাহেবের সায় ছিল কাউটস্কির অনুকূলে। লেনিন, রেনিগেড কাউটস্কি শিরোনামে একটি পুস্তিকা লিখে কাউটস্কিকে কষে গালাগাল দিয়েছিলেন। এখন

অনেকেই মনে করছেন কৃষিপ্রশ্নে লেনিন–কাউটস্কি যে বিতর্ক হয়েছিলো, তাতে কাউটস্কির অবস্থানটিই সঠিক ছিল।] রাজ্জাক সাহেবকে এভাবে বোধ করি বিচার করা যায়, এ ট্রটস্কিয়াইট এ্যামাং দ্যা মুসলিম লীগারস।

আমি রাজ্জাক সাহেবের হয়ে কৈফিয়ত দেয়ার কেউ নই। তথাপি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটা বিরাট অংশের কাছ থেকে শুনে আসছি, আসলে অকারণে একটা রাজ্জাক মিথ খাড়া করা হয়েছে। রাজ্জাক সাহেবের ভেতরে সারপদার্থ অধিক নেই। যদি কিছু বলার থাকত অবশ্যই তিনি লিখে প্রকাশ করতেন। রাজ্জাক সাহেব কেনো লেখেননি সে জবাব দেয়ার আমি কেউ নই। তার পরেও একটা কারণে রাজ্জাক সাহেবকে আমি ধন্যবাদ না দিয়ে পারি না, তিনি এই মহাজনদের পন্থা অনুসরণ করে তাঁদের স্তরে নেমে আসেননি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একাংশের মধ্যে আরও একটা ধারণা চালু আছে। সেটা হলো এই, রাজ্জাক সাহেব আগাগোড়া কোনো বই পড়েন না। তাঁর ভক্তদের চমক লাগাবার জন্য বইয়ের ফ্ল্যাপ এবং গ্রন্থপরিচিতি মাত্র পাঠ করে সকলের সামনে তিনি যে কত বড় মহাজ্ঞানী সেটা প্রমাণ করে থাকেন। এই অভিযোগটির জবাব দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যাঁরা অভিযোগ উচ্চারণ করেন, তাঁদের অপকৃষ্ট রুচি দেখে ব্যথিত অনুভব করি মাত্র। আমি রাজ্জাক সাহেবের সঙ্গে কোনো পদ্ধতি অনুসরণ করে কোনোদিন বাক্যালাপ করিনি। তিনি কথা বলেছেন আমি শুনেছি। তিনি যে স্পিরিটে কথা বলেছেন, আমি সেভাবে গ্রহণ করতে পেরেছি এমন দাবিও করতে পারবো না। যা শুনেছি, তার সবটাও স্মৃতিতে ধরে রাখা সম্ভব হয়নি।

আমার এ রচনায় রাজ্জাক সাহেবের পাণ্ডিত্য এবং মননশীলতার কতিপয় প্রান্ত আমি তুলে ধরতে চেষ্টা করছি। আমার মতো একজন সামান্য মানুষের পক্ষে রাজ্জাক সাহেবের অগাধ পাণ্ডিত্য পরিমাপ করা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি তাঁর সমালোচকদের অভিযোগের জবাব প্রত্যাশা করাও সমীচীন হবে না। আমি তাঁকে নানা সময়ে যেভাবে অনুভব করেছি, সেই অনুভবটুকু সকলের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করছি মাত্র।

আমার সন–তারিখের ঠিক থাকে না। আর ডায়েরি লেখার অভ্যাসও আমার নেই। স্মৃতির গভীর থেকে এই বিষয়গুলো টেনে টেনে বার করছি। কোনটা আগে কোনটা পরে পারম্পর্য রক্ষা হচ্ছে না। আমি একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলাম। আমরা তৎকালীন সরকারবিরোধী একটা প্যানেল দিয়েছিলাম। একজন ছাড়া অন্য প্রার্থীদের নাম মনে পড়ছে না। তিনি মীর্জা গোলাম হাফিজ। নামকরা উকিল এবং বিএনপি

সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী। রাজ্জাক সাহেবকে আমি আমাকে ভোট দিতে অনুরোধ করেছিলাম। তিনি চোখ কপালে তুলে বলেছিলেন, আপনে আবার ওইগুলার মধ্যে গেছেন ক্যান?

আমি বললাম, স্যার, সকলে ধরে বসলেন, আমি না করতে পারলাম না। স্যার হুঁকা টানতে টানতে বললেন, ঠিক আছে আপনে যখন এক্কেরে খাড়াইয়া গেছেন, একটা ভোট আপনেরে দিমুনি।

স্যার সত্যি সত্যি আমাকে ভোট দিয়েছিলেন। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। ওই নির্বাচনে আমি হেরেছিলাম। একজন ছাড়া আমাদের প্যানেলের কেউ জিততে পারে নি। তিনি মীর্জা গোলাম হাফিজ। হাফিজ সাহেব তলায়–তলায় আমাদের বিরোধী প্যানেলের সঙ্গেও একটা বোঝাপড়া করে ফেলেছিলেন। এই এক মজার লোক! যে কথা তিনি শুনতে চান না, কেউ যদি বলেন, তিনি হাত–পা নেড়ে জানিয়ে দেন, তুমি কী বলছো আমি শুনতে পাচ্ছি না। কারণ আমি কানে কম শুনি। যে কথা তিনি পছন্দ করেন, ঠিকই শুনে ফেলেন। একবর্ণও বাদ পড়ে না। নির্বাচনে আমার অবস্থাটা হয়েছিলো সবচাইতে করুণ। আমাদের এজেন্ট ড. আহমেদ কামাল জানিয়েছিলেন, আমার নিজের ভোটটাও বাতিল হয়ে গিয়েছিলো। কোথায় টিকচিহ্ন দিতে কোথায় দিয়ে ফেলেছি!

নির্বাচনে হেরে একটু একটু খারাপ করছিলো। তার পরের দিন স্যারের বাড়িতে গেলাম। তিনি বোধহয় আমার মনের অবস্থাটা বুঝতে পেরেছিলেন। সেজন্য লম্বা–চওড়া এক গল্প ফেঁদে বসলেন। পাকিস্তান হওয়ার আগে সিনেট নির্বাচনে কিভাবে হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে প্রতিযোগিতা হতো সেকথা জানালেন। নওয়াববাড়ির খাজা শাহাবুদ্দিন নির্বাচনের ফন্দিফিকির খুব ভালো করে বুঝতেন। সেই সময়ে মুসলিম রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা ছিলো হিন্দুদের তুলনায় খুবই সামান্য। সারা দেশে ছড়িয়ে–ছিটিয়ে থাকা ভোটারদের কাছে হাজির হয়ে ব্যালটপেপার সই করিয়ে নিয়ে আসতো। রাজ্জাক স্যার জানালেন, তিনি একবার অনেকদূর পায়ে হেঁটে কুমিল্লা জেলার নবীনগর থানায় গিয়েছিলেন। নবীনগরে একজন সাব রেজিস্ট্রার থাকতেন। তাঁর কাছ থেকে ব্যালটপেপারটা হাতে–হাতে নিয়ে আসার জন্য স্যারকে পায়ে হেঁটে অতোদূর যেতে হয়েছিলো।

দিল্লি থেকে প্রকাশিত ইলাস্ট্রেটেড উইকলি অভ ইন্ডিয়া পত্রিকাটি সেই সময়ে খুব সম্ভবতো প্রখ্যাত শিখ লেখক খুশবন্ত সিং সম্পাদনা করতেন। ওই পত্রিকাটির একটি সংখ্যায় রাজ্জাক স্যারের ওপর প্রধান রচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমানে মার্কিনপ্রবাসী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষিকা ড. রওনক জাহানের

ওপর অপর একটি রচনা ইলাস্ট্রেটেড উইকলিতে প্রকাশিত হয়েছিলো। পাশাপাশি রাজ্জাক স্যার এবং ড. রওনক জাহানের ছবি প্রকাশিত হয়েছিলো।

রাজ্জাক স্যারের ওপর লিখিত রচনাটিতে তাঁর সম্পর্কে যেসকল কথা লিখিত হয়েছিলো, তার সবকিছু অক্ষরে–অক্ষরে আমি মনে করতে পারবো না। ইলাস্ট্রেটেড উইকলির প্রতিবেদক তাঁকে গ্রীক দার্শনিক ডায়োজিনিসের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। এটা নতুন কথা নয়। এখানে অনেকেই তাঁকে ডায়োজিনিস বলে ডাকতেন। ওই পত্রিকায় তাঁকে ছয় দফার মূল প্রণেতা বলে উল্লেখ করা হয়েছিলো। ড. রওনক জাহান 'পাকিস্তান : ফেলিউর অভ ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন' গ্রন্থটিতে দু'অঞ্চলের বৈষম্যের তুলনা করে দেখিয়েছিলেন পাকিস্তানের অখণ্ডতা স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

তার কিছুদিন পরে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় রাজ্জাক স্যারকে ডিলিট উপাধি দিয়ে সম্মানিত করে। এই ডিলিট ডিগ্রিপ্রাপ্তির ঘটনাটিকে উপলক্ষ করে আমি স্যারকে একটা সিল্কের পাঞ্জাবি, পাজামা, একটি ভালো ফাউন্টেন পেন এবং খুব দামি কিছু লেখার কাগজ উপহার দিয়েছিলাম। আমি অনুরোধ করেছিলাম, স্যার যেনো আমার উপহার দেয়া কলম এবং কাগজে তাঁর আত্মজীবনীটা লেখা শুরু করেন।

আত্মজীবনী লেখার কথা যখন উঠল স্যার হাসতে হাসতে একটা ঘটনার উল্লেখ করলেন, আমি একবার মিস্টার এ কে ফজলুল হকরে যাইয়া কইলাম, আমি আপনের জীবনীটা লেখবার চাই। আপনে যদি দয়া কইর‍্যা পারমিশনটা দেন, কাজ শুরু করবার পারি। হক সাহেব তখন ইস্ট পাকিস্তানের গভর্নর। আমার প্রস্তাব শুইন্যা খেকাইয়া উইঠ্যা কইলেন, আমার জীবনী লেখতে চাও, নিশ্চয়ই তোমার একটা মতলব আছে। আমি কইলাম, মতলব ত একটা অবশ্যই আছে। হক সাহেব কইলেন, আগে হেইডা কও। আমি কইলাম, আপনে যখন গাঁও গেরামে যান, মাইনষের লগে এমন ব্যবহার করেন, তারা মনে করে জনম ভইর‍্যা আপনে গাঁও গেরামে কাটাইয়া তাগো সুখদুঃখের অংশ লইতাছেন। তারপরে গাঁও গেরাম থেইক্যা ঢাহা শহরে আইস্যা আহসান মঞ্জিলের ছাদে উইঠ্যা নওয়াব হাবিবুল্লাহর লগে যখন ঘুড্ডি উড়ান, লোকজন দেইখ্যা আপনেরে নওয়াববাড়ির ফরজন্দ মনে করে। তারপরে আবার যখন কলিকাতায় যাইয়া শ্যামাপ্রসাদের লগে গলা মিলাইয়া শ্যামাপ্রসাদরে ভাই বইল্যা ডাক দেন কলিকাতার মানুষ চিন্তা করে আপনে শ্যামাপ্রসাদের আরেকটা ভাই। বাংলার বাইরে লখনৌ কিংবা এলাহাবাদে গিয়া মুসলিম নাইট নবাবগো লগে যখন বয়েন, দেখলে মনে অইব আপনে তাগো একজন। এই এতগুলা

ভূমিকায় আপনে এত সুন্দর সাকসেসফুল অভিনয় করতে পারেন, এইডা ত একটা মস্ত ক্ষমতা। এই ক্ষমতা স্যার অলিভার লরেন্সেরও নাই। এই অভিনয়ক্ষমতার একটা এনকোয়ারি আমি করবার চাই। আর নইলে আপনের আসল গুণপনা কোথায় হেইডা ত আমাগো অজানা নাই। হক সাহেব হুঙ্কার ছাইড়্যা জিগাইতে লাগল, তুমি আমার সম্পর্কে কী জান? আমি কইলাম, আপনে সুন্দর সুন্দর বিশ্বাসযোগ্য মিছা কথা কইবার পারেন। আমার জবাব শুইন্যা হক সাহেব হ হ কইর‍্যা হাইস্যা উঠলেন।

হক সাহেব সম্পর্কে কথাবার্তা আর বেশিদূর অগ্রসর হতে পারলো না। মিসেস হামিদা হোসেন এসে গেছেন। মিসেস হোসেন শেখ সাহেবের কেবিনেটের জাঁদরেল মন্ত্রী ব্যারিষ্টার কামাল হোসেনের বেগম। এই ভদ্রমহিলা রাজ্জাক স্যারের বিশেষ স্নেহের পাত্রী। তিনি ছাত্রী থাকাকালীন বিলেতের অক্সফোর্ড না ক্যামব্রিজে এ কে ফজলুল হকের ওপর গবেষণা করছিলেন। ফজলুল হক সম্পর্কিত তথ্যাদি জানার জন্য ঢাকায় রাজ্জাক সাহেবের কাছে এসেছিলেন। রাজ্জাক সাহেবের বাড়িতেই হামিদার সঙ্গে ড. কামালের পরিচয়। পরিচয়ের পর প্রেম, তারপর বিয়ে।

রাজ্জাক সাহেবের কিছু পছন্দের মানুষ আছেন। তার মধ্যে ড. কামাল সাহেব বিশিষ্ট একজন। ড. কামাল হোসেন, বদরুদ্দীন উমর, ড. আনিসুজ্জামান, ড. রওনক জাহান, সরদার ফজলুল করিম, ড. সালাউদ্দিন আহমদ, ড. মোশাররফ হোসেন, ড. মমতাজুর রহমান তরফদার এঁরা তার পছন্দের মানুষ। এ ছাড়া নিশ্চয়ই অনেকে আছেন, কিন্তু আমি তাঁদের নাম জানি না। ড. আনিসুজ্জামানের প্রতি তাঁর এক বিশেষ ধরনের স্নেহ রয়েছে। সরদার ফজলুল করিমকে তিনি প্রায় সময়ে স্মরণ করতেন। সমুদ্রের জোয়ারভাটার মতো তাঁর সম্পর্কেরও ওঠানামা আছে। একসময় ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক মরহুম সাজ্জাদ হোসেনের সঙ্গে তাঁর উষ্ণ সম্পর্ক ছিলো। নানা সামাজিক রাজনৈতিক প্রশ্নে তাঁদের মধ্যে মতান্তর ঘটে যায়। তাঁর পছন্দ অপছন্দের বোধটি এত প্রবল যে মতান্তর ঘটলেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মনান্তর ঘটে যায়। কবি সৈয়দ আলী আহসানের সঙ্গে সম্পর্কটা সেই উনিশশো নব্বই একানব্বই পর্যন্ত আমি বেশ হৃদ্যতাপূর্ণ লক্ষ করেছি। আরেকজন মানুষকে তিনি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা করতেন। সেই ভদ্রলোকটি ছিলেন মরহুম ড. খোন্দকার মোকাররম হোসেন। খোন্দকার সাহেবের মৃত্যুর পরেও তাঁর পরিবারের দেখাশোনা করতে দেখেছি। মোকাররম সাহেবের ছেলের সঙ্গে নিজের ভ্রাতুস্পুত্রী দীপ্তির বিয়ে দিয়েছিলেন। কুমিল্লা পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর প্রাক্তন ডিরেকটর এবং জিয়া সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী জনাব

আজিজুল হককে ভীষণ পছন্দ করতেন। আমার কাছে প্রায়ই বলতেন, তাঁর যোগ্যতা বিশ্বমানের।

রাজ্জাক স্যার একটা কথা প্রায়ই বলতেন। আমরা শিক্ষকেরা প্রতি বছরই বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু প্রতিটি নতুন বছরে আমাদের কাছে নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা এসে হাজির হয়। এই তরুণদের চাহিদা, চাওয়া–পাওয়ার খবর আমাদের মতো লোলচর্মের বৃদ্ধদের জানার কথা নয়। এটাই হল শিক্ষক–জীবনের সবচাইতে বড় ট্র্যাজেডি। তার পরেও রাজ্জাক সাহেবের চরিত্রের মধ্যে এমন একটা আকর্ষণী শক্তি ছিলো, বিশ্ববিদ্যালয়ের নানান বিভাগের দীপ্তিমান ছাত্রদের তিনি চুম্বকের মতো আকর্ষণ করতেন। কারও মধ্যে সামান্যতম গুণের প্রকাশ দেখলেও তিনি সাধ্যমতো সাহায্য করতে চেষ্টা করতেন। একবার আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারারের চাকুরির দরখাস্ত করেছিলাম। আমার ধারণা তিনি আমাকে স্নেহ করেন। কিন্তু আমার জন্য সুপারিশ না করে মাদ্রাসা থেকে আগত এক ভদ্রলোকের জন্য সুপারিশ করেছিলেন এবং তাঁর চাকুরিটি হয়েছিলো। ভদ্রলোক আরব দার্শনিক আল মাওয়ারদির একটি লেখা আরবি থেকে বাংলায় অনুবাদ করে দেখিয়েছিলেন। রাজ্জাক স্যার প্রায়ই আফসোস করতেন, আরবি ফারসি এবং সংস্কৃত পালি জানা লোকের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে দুর্লভ হয়ে উঠছে। এই ভাষাগুলোর অভাবে ওরিজিন্যাল সোর্স ব্যবহার করার ক্ষমতা কারও জন্মাবে না। সেকেন্ড হ্যান্ড সোর্স পর্যালোচনা করে যেসব গবেষণাকর্ম করা হচ্ছে, সেগুলোর মধ্যে বিস্তর অপূর্ণতা থেকে যাচ্ছে।

রাজ্জাক স্যার ব্যক্তিগতভাবে অঙ্কের শিক্ষক রমজান আলী সরদারকে পছন্দ করতেন এমন মনে হয়নি। কিন্তু তিনি তাঁর খুব প্রশংসা করতেন। সরদারই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র ছাত্র যিনি অক্সফোর্ডে র‍্যাংলার হতে পেরেছিলেন। রাজ্জাক স্যার মনে করতেন সরদার যদি তাঁর সাধনার প্রতি যত্নবান হতেন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অঙ্কবিদদের একজন হতে পারতেন। সলিমুল্লাহ্ খানের বয়স আমার চাইতে অন্তত পনেরো বছর কম। সে রাজ্জাক সাহেবকে নির্জলা বকাঝকা করে আস্ত একটা বই লিখে ফেলেছিলো। বইটি পড়ে শুধু আমি নই, রাজ্জাক স্যারের ঘনিষ্ঠদের অনেকেই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। সলিমুল্লাহ্ খান পুস্তক রচনা করে বসে থাকেনি। এক কপি নিজের হাতে লিখে বাড়িতে গিয়ে উপহার দিয়ে এসেছিলো। সাহস করে স্যারের প্রতিক্রিয়া জানার চেষ্টা করিনি। একবার সলিমুল্লাহর ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা বৃত্তি পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলো। দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির সার্টিফিকেট খুবই প্রয়োজন। তার মধ্যে

একজন প্রফেসর রাজ্জাক, অন্যজন ড. কামাল হোসেন। সলিমুল্লাহ্ আমাকে বারবার অনুরোধ করতে লাগলো আমি যেনো তাঁকে স্যারের কাছে নিয়ে যাই। স্যারকে তো তাঁকে প্রশংসাপত্র দিতে হবে। অধিকন্তু ড. কামালের প্রশংসাপত্রও সংগ্রহ করে দিতে হবে। আমি বারবার এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সলিমুল্লাহ নাছোড়বান্দা। অগত্যা একদিন বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে স্যারকে গিয়ে বললাম, কাল সকালে আপনার ওখানে নাস্তা করতে যাবো। স্যার বললেন, ঠিক আছে আয়েন। একথা বলে স্যার দাবাখেলায় মন দিলেন। আমি আবার স্যারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, স্যার সলিমুল্লাহ্ খানও আমার সঙ্গে আসার বায়না ধরেছে। স্যার বললেন, ঠিক আছে লইয়া আয়েন।

স্যার তখন একা থাকতেন। পরিবারের অন্য সদস্যরা গুলশানের বাড়িতে চলে গেছেন। সলিমুল্লাহ্ খানের সঙ্গে যথারীতি কথাবার্তা বললেন। কোন বিষয়ের ওপর গবেষণা করতে চায়, ও নিয়েও আলাপ করলেন। চলে আসার সময় সলিমুল্লাহ্কে বললেন, ঠিক আছে দুইদিন বাদে আয়েন। কাইল আমি কামাল হোসেনের কাছে যামুনে। সেবার সলিমুল্লাহ্র ক্যামব্রিজ যাওয়া হয়নি। কিন্তু রাজ্জাক স্যার নিজে প্রশংসাপত্র লিখে দিয়েছিলেন এবং ড. কামাল হোসেনের কাছ থেকেও প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করে এনে দিয়েছিলেন।

কিছুদিন পর আমি স্যারের কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলাম, সলিমুল্লাহ্র বইটি তিনি পড়েছেন কি না। স্যার বললেন, হ পড়ছি। তাতে কী অইছে। ছেলেটার ত ট্যালেন্ট আছে। কী লিখছে না-লিখছে হেইডা মনে কইর্যা কী লাভ। হের ত কিছু করার ক্ষমতা আছে। হামিদাও আমারে একই কথা কইল। আমি যখন কামালরে কইলাম দুই লাইন লেইখ্যা দাও, হামিদা কয় হেই ছেলেটা না যে আপনের ওপর বই লেখছে? হেরে আমি ঘরে ঢুকবার দিমু না। আমি কইলাম, হেইডা কি একটা কথা অইল, একটা প্রমিসিং ছেলে, এমন কয়জন পাওন যায়, দাও দুই কলম লেইখ্যা। সলিমুল্লাহ্ খান যখন আমেরিকা গেলো, প্লেনভাড়ার টাকার এক অংশ রাজ্জাক স্যার দিয়েছিলেন। এখনও সলিমুল্লাহ্র খবরাখবর জানতে চান।

রাজ্জাক সাহেবকে একেবারে বৈষ্ণব মনে করাও ঠিক হবে না। কারও ওপর যদি তাঁর মনে উঠে যায়, ফেরানো প্রায় একরকম অসম্ভব। আমি কোনো কারণে গত বিশ পঁচিশ বছর ধরে রাজ্জাক স্যারের স্নেহ পেয়ে আসছি, সেটা আমার নিজের কাছে একটা বিস্ময়ের ব্যাপার মনে হয়। আমি রাজ্জাক স্যারের কোনো কথা শুনিনি। তিনি যা বলেছেন, উলটো কাজ করেছি। পরিচিত হওয়ার কয়েকদিন পর থেকেই তাঁর সামনে সিগারেট খেতে আরম্ভ করেছি। আমি সে

সময়ে বাঁশি বাজাতে চেষ্টা করছিলাম। এমন কিছু বাজাতে শিখিনি, তবু শুধু তাঁকে নয়, তার পরিবারের প্রায় সবাইকে আমার সে বর্বর বাজনা শুনতে বাধ্য করেছি। আমি একসময়ে কাঠ কয়লা, আলকাতরা, বাটা হলুদ, ফুলের রঙ হাতের কাছে যা পাই, তা দিয়ে ছবি আঁকতে শুরু করেছিলাম। যেহেতু আমার অর্থসংকট যাচ্ছিলো, সেজন্য এক ছবি তিন–তিনবার কিনতে তাঁকে রাজি করিয়েছি। মহাকবি গ্যোতের ফাউস্ট যখন অনুবাদ করছিলাম, দিনে রাতে তাঁকে কত বিরক্ত করেছি। যখনই টাকার অভাব পড়েছে, হুকুম করেছি অতো টাকা অমুক দিন আমার চাই। উনার হাতে টাকা আছে কি না সে খবর নেয়ার প্রয়োজনও বোধ করিনি। সেই পেছনের দিনগুলোর কথা যখন ভাবি, আমি অবাক হয়ে যাই। রাজ্জাক স্যার আমাকে এতটা প্রশ্রয় দিয়েছিলেন কেমন করে!

সে সময়ে আমেরিকান পররাষ্ট্র সচিব হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশে এসেছিলেন। এই ইহুদি বংশোদ্ভূত কুশাগ্র বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিটি ছিলেন বাংলাদেশের পয়লা নম্বরের শত্রু। তিনি নিকসন প্রশাসনকে প্রভাবিত করে মুক্তিযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বাঙালি জনগণের বিপক্ষে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই কিসিঞ্জার সাহেবই বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি বলে চিহ্নিত করেছিলেন। তখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি পর্যন্ত দেয়নি। তথাপি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে রাজকীয় সংবর্ধনার আয়োজন করে কিসিঞ্জারকে বরণ করতে হচ্ছিলো। এই মার্কিন কূটনীতিবিশারদের নেক নজরে পড়ার জন্য মন্ত্রিসভা থেকে সোভিয়েতঘেঁষা সহকর্মীদের বাদ দিতে হল। মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দীন আহমদও রেহাই পেলেন না।

কিসিঞ্জারের সম্মানে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে এক সংবর্ধনাসভার আয়োজন করা হয়েছিলো। হোটেল শেরাটনের নাম ছিল তখন হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টাল। নিমন্ত্রিত অতিথির তালিকায় রাজ্জাক স্যারের নামও ছিল। এখন ঠিক মনে আসছে না। অনুষ্ঠানটি কখন ছিল, সকালবেলা না বিকেলবেলা। সেদিন স্যারের বাড়িতে আমি ছিলাম। ড. রওনক জাহানও ছিলেন। আমার মনে নেই ড. রওনক জাহান স্যারকে কিসিঞ্জারের অনুষ্ঠানে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার জন্য গিয়েছিলেন কি না। হুঁকোর নলটি রেখে খদ্দরের চাদরটি কাঁধের ওপর ঝুলিয়ে বললেন, একটু ঘুইর‍্যা আহি। ড. রওনক জাহান বললেন, ওমা, এই বেশে আপনি কোথায় চললেন?

স্যার বললেন, ওই যে লোকে কয় কিসিঞ্জার সাব আইছেন, একটু মোলাকাত কইর‍্যা আহি।

ড. রওনক জাহান বললেন, এই কাপড়ে আপনি সেখানে যাবেন?

রাজ্জাক স্যার ধরা পড়ে যাওয়া অপরাধী বালকের মতো মুখ নিচু করে বললেন, আমার আর কোনো কাপড়চোপড় নাইক্যা।

আমি বললাম, সেদিন তো স্যার আপনাকে একটা সিল্কের সুন্দর পাঞ্জাবি দিলাম, কোথায় রাখছেন?

স্যার বললেন, দিছিলেন ত ঠিকই, অখন কই রাখছি মনে পড়ে না। আমরা সকলে মিলে ঘরের আনাচে কানাচে খুঁজতে লাগলাম। একসময় পাঞ্জাবির সন্ধান পাওয়া গেল। তিনি মুড়ির টিনের মধ্যে সুখে নিদ্রা দিচ্ছিলেন।

কিছুদিন পরে ডিক উইলসন সাহেবের লেখা বৃহৎ কলেবরের গ্রন্থ 'এশিয়া অ্যাওয়েকস' প্রকাশিত হল। উইলসন সাহেব তাঁর গ্রন্থের উৎসর্গের বাক্যটা এভাবে লিখেছেন, 'টু আবদুর রাজ্জাক অব ঢাকা, হু ব্রট ইস্ট ইন মাই মাইন্ড'। আজিজুল হক মন্তব্য করলেন, ডিক উইলসন সাহেবের গ্রন্থটি মানের দিক দিয়ে গুনার মিরডালের এশিয়ান ড্রামার কাছাকাছি। 'এশিয়ান ড্রামা'র জন্য গুনার মিরডালকে পরে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়েছিলো। তখনও আমি 'এশিয়ান ড্রামা' পড়িনি। কিছুদিনের মধ্যেই 'এশিয়ান ড্রামা' এবং 'এশিয়া অ্যাওয়েকস' দুটো বই পাশাপাশি পড়ার সুযোগ হলো।

ডিক উইলসনের উৎসর্গবাক্যটি পাঠ করেই আমার দৃষ্টি থেকে একটা পর্দা সরে গেলো। ডিক উইলসনের মতো একজন বিশ্বনন্দিত স্কলারকে যিনি প্রভাবিত করতে পারেন, তাঁর মেধা এবং মনীষা কতদূর প্রসারিত হতে পারে, ধারণা করার ক্ষমতাও তাঁর চারপাশে যে-সমস্ত মানুষ ঘুরে বেড়ান, যাঁরা তাঁর চাটুকারিতা করেন, কিংবা নিন্দা করেন তাঁদের নেই। তার পর থেকে রাজ্জাক স্যারকে আমি পাটক্ষেতে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো বটবৃক্ষের মতো দেখে আসছি। তাঁর সামনে গেলে সবসময়েই আমার মনে হতো আমি বিশাল কিছু, গভীর কিছুর সন্নিধানে উপনীত হয়েছি।

রাজ্জাক স্যারের সঙ্গে একটা বিষয়ে শিল্পী জয়নুল আবেদীন সাহেবের চমৎকার মিল লক্ষ করেছি। আবেদীন সাহেব প্রকৃত কাজের মানুষদের চিনতে পারতেন। রায়ের বাজারের মৃৎশিল্পীদের পল্লী থেকে আবেদীন সাহেব মরণচাঁদকে আবিষ্কার করেছিলেন। মরণচাঁদের দক্ষতা এবং সততায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে আর্ট কলেজে একটা চাকুরি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। উত্তরকালে মরণচাঁদের একজন ভাস্কর হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটে। ঋজুতা এবং চারিত্রিক স্বচ্ছতার দিকটি বিচার করে আর্ট কলেজের শিক্ষক হিসেবে মোস্তফাকে নিয়োগ করেছিলেন। আবেদীন সাহেবের পছন্দের মানুষ দুটি রাজ্জাক সাহেবেরও বিশেষ প্রিয়ভাজন হয়ে উঠেছিলেন। আর মোস্তফা রাজ্জাক স্যারের অনুগৃহীতদের মধ্যে বিশেষ একজন হয়ে গিয়েছিলেন।

ছয়

একদিন সকালবেলা স্যারের বাড়িতে গিয়ে দেখি, তিনি একা একা দাবা খেলছেন। আমাকে দেখামাত্রই জিগ্‌গেস করলেন, মৌলবি আহমদ ছফা কী খবর?

পাছে স্যার অন্য প্রসঙ্গ তুলে প্রয়োজনটা ভুলিয়ে দেন সেই আশঙ্কা করে আগেভাগে আমার আরজিটা পেশ করে বসলাম। বললাম, স্যার, দরিয়ায় ঘিইর‍্যা গেছি, উদ্ধার পাইবার পথ বাতলাইয়া দেন। স্যারের সঙ্গে কথা বলে বলে একআধটু ঢাকাইয়া বুলি ব্যবহার করতে শিখে গিয়েছি।

স্যার বললেন, কোনো খারাপ খবর নিহি?

আমি জবাবে বললাম, তেমন খারাপ খবর নয়।

স্যার বললেন, তয় কন অইছেডা কী।

আমি কথাটা এইভাবে শুরু করলাম। ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবের ধাক্কা বেঙ্গলেও এসে লেগেছিল। এই বিষয়ের ওপর আমাকে আলোকপাত করে অন্তত দশপাতা লিখতে হবে। কিন্তু তার আগে শিল্পবিপ্লব জিনিসটা কী জানতে চাই। অল্পের মধ্যে ধারণা নিতে পারি, এমন একটা বইয়ের কথা বলেন।

স্যার বললেন, টয়েনবির লেখা ষাট–সত্তর পৃষ্ঠার বই আছে। পইড়্যা দেখবার পারেন। টাইটেল ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভ্যুল্যুশন।

আমি বললাম, ইনি কি ঐতিহাসিক টয়েনবি।

স্যার বললেন, না, তাঁর চাচা। ভদ্রলোক এক্কেরে তরুণ বয়সে মারা গিয়েছিলেন। বড় জোর তিরিশ একতিরিশ। ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভ্যুল্যুশন টার্মটা তিনিই কয়েন করেছিলেন। তিনি নিজে লেখাটি লিখে যাননি। তাঁর লিখিত নোটস্ পর্যালোচনা করে বন্ধুবান্ধবেরা বইটি তৈরি করেছিলেন। নতুন এডিশনে জুনিয়র টয়েনবি মানে ঐতিহাসিক টয়েনবি একটা ছোট্টো অথচ চমৎকার ভূমিকা লিখেছেন।

আমি লাইব্রেরিতে গিয়ে বইটা ইস্যু করে আনলাম। সিনিয়র টয়েনবির যুক্তির ধারা এবং চিন্তার স্বচ্ছতা আমাকে একেবারে মুগ্ধ করে ফেললো। ইংল্যান্ডে কোন আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে শিল্পবিপ্লবের সূচনা হয়েছিল, তার আগে কৃষিতে কী পরিবর্তন ঘটেছিল টয়েনবি সাহেব তার পেছনের কারণগুলো প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন। টয়েনবির বইটা পাঠ করার পর আমার মনে হলো গতকালের আমি–র সঙ্গে আজকের আমি–র অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। একেকটা বইয়ের চিন্তা–চেতনার ওপর প্রভাব বিস্তার করার কী

অপরিসীম ক্ষমতা! ফেডারিক এঙ্গেল্‌স–এর কনডিশন অব দ্যা ওয়ার্কিং ক্লাস ইন ইংল্যান্ড পাঠ করার পরেও আমার মনে এমন একটা ভাবান্তর জন্ম নিয়েছিলো।

পরের দিন সকালবেলা যাকে বলে 'রক্তবেগতরঙ্গিত' বক্ষে স্যারের ওখানে হাজির হলাম। স্যার সদ্য ঘুম থেকে উঠে টেবিলের ওপর চরণযুগল উঠিয়ে দিয়ে গুড় ক গুড় ক হুঁকো টানছেন। স্যার বললেন, মৌলবি আহমদ ছফা এত বেয়ানবেলা চইল্যা আইলেন?

আমি জবাব দিলাম, হ স্যার চইল্যা আইলাম, কারণ টয়েনবি সাহেবের বইটা পড়লাম।

কী মনে অইল? স্যারের প্রশ্ন।

আমি বললাম, এতকাল তো আমি এ বিষয়ে কিছুই জানতাম না। একটা ভাসাভাসা ধারণা ছিলো মাত্র।

স্যার বললেন, পড়বেন স্যেন, তারপরে ত জানবেন। এই বিষয়ে আপনি আরও কিছু জানতে চান নিহি?

আমি বললাম, আপনার কাছে আর কোনো বই আছে?

স্যার বললেন, আমি মেনটোর বইটা দিবার পারি।

তিনি শেলফ থেকে বের করে বইটি দিলেন এবং বললেন, তাড়াহুড়া কইরেন না। কী পড়ছেন, হেইডা পরিষ্কারভাবে বুঝবার চেষ্টা করবেন।

আমার খুব খারাপ লাগছে, বইটির টাইটেল ভুলে গিয়েছি। তিন–চারদিন বাদে বইটি যখন ফেরত দিতে গেলাম, স্যার শেলফ থেকে ফ্যাকটরস ইন মডার্ন হিস্ট্রি শিরোনামে একটি বই আমাকে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, এইডা দেখবার পারেন। ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভ্যুলুশনের বিষয়টা বিশদভাবে এই বইতে আলোচনা করা অইছে।

লেখকের নামটিও আমি মনে করতে পারছি না। অজানা বিষয়ে জানার যে একটা আনন্দ আছে, সেই জিনিসটা তখন আমাকে পেয়ে বসেছে। একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন, ইংরেজ না আমেরিকান বলতে পারবো না পি. এন. হেক্সটার নামে ভদ্রলোক সাম্প্রতিককালে ওই একই শিরোনামে ফ্যাক্টরস ইন মডার্ন হিস্ট্রি নামে একটা বই লিখেছেন। এই বইটা যখন ফেরত দিলাম, স্যারের মধ্যে একটা সিরিয়াস মনোভাব লক্ষ করলাম। তিনি অধিকতর যত্নসহকারে ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ অর্থনীতির নানা পর্যায় সম্পর্কে আমার আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে আরম্ভ করলেন। তিনি বললেন, একোনমিকস্ সায়েন্সের প্রতি আপনের আগ্রহটা জাগছে এইডা ভালা লক্ষণ। আপনেগো সাহিত্যের লোকেরা বেশিরভাগ যেইসব কথা লেখে তার মধ্যে ছানা জিনিস বিশেষ থাকে না। স্যার

ইকোনমিকস্ শব্দটাকে সবসময় একোনমিকস্ উচ্চারণ করে থাকেন। তিনি শেলফ থেকে ধুলো ঝেড়ে অ্যাডাম স্মিথের দ্যা ওয়েলথ অভ ন্যাশনস বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, এইডা একটু নাড়াচাড়া কইর‍্যা দেখেন। কাণ্ডজ্ঞানটা পোক্ত অইব।

অজানা একটা জিনিসকে জানার প্রচণ্ড একটা উত্তেজনা আছে। আমি অ্যাডাম স্মিথ পড়তে শুরু করলাম। স্কুলে থাকার সময়ে যেরকম তন্ময় হয়ে গোয়েন্দাগল্প পাঠ করতাম, অনেকটা সেই আবেগ নিয়ে অর্থনীতির বইগুলো পাঠ করছিলাম। এই বিদ্যা আমার কোনো কাজে আসবে কি না সে চিন্তা আমার মনে একবারও উদয় হয়নি। অ্যাডাম স্মিথ যখন ফেরত দিলাম, স্যার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, আপনেরা ত মার্কস নিয়া খুব মাতামাতি করেন, কিন্তু মার্কস যার কাছে অধিক ঋণী হেই রিকার্ডোর সম্পর্কে কিছু জানলে মন্দ অয় না। তিনি তো আমাকে রিকার্ডোর বই দিলেন, কিন্তু রেন্ট ইত্যাদি তত্ত্ব পড়তে গিয়ে আমার জান যাওয়ার যোগাড়। এখনও মনে হয় না রিকার্ডো সাহেবের খটমটে তত্ত্ব আমি বুঝতে পেরেছি। অথচ মার্কস সাহেবের ক্যাপিটাল প্রথম এবং দ্বিতীয় খণ্ড সে তুলনায় আমার কাছে অনেক সহজ মনে হয়েছে। মুশকিলের ব্যাপার হল, স্যার ধরে নিয়েছেন, আমি যা পড়ছি, ঠিকমতো বুঝতে পারছি।

তারপর তিনি ম্যাকসভেবরের 'প্রোটেস্টান্ট এথিকস অ্যান্ড স্পিরিট অব দ্যা ক্যাপিটালিজম' আমাকে দিলেন। ম্যাকসভেবরের বইটি আমার এত ভালো লেগে যায় যে নিজের উদ্যোগেই খোঁজখবর নিয়ে তার অন্যান্য রচনা সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে উঠি। ভেবরের রিলিজিয়ানস অব ইন্ডিয়া বইটি পাঠ করে আমি সবিশেষ উপকৃত হয়েছি।

একদিন স্যার আমাকে বললেন, সাহিত্যের পুরোনো স্ক্রিপট পর্যালোচনা করে সমাজবিজ্ঞানের গবেষণা করার ট্র্যাডিশন আমাদের বাংলা ভাষায় গড়ে ওঠেনি। এই ধরনের কিছু কাজ করার আমার উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। স্যার তাঁর শিক্ষক হ্যারল্ড লাস্কির লিবারালিজম অ্যান্ড দ্যা রাইজ অব ইউরোপিয়ান ক্যাপিটালিজম পড়তে দেন। বইটি যখন পড়ে ফেরত দিতে গেলাম, স্যার জিগ্‌গেস করলেন, বই ত পইড়্যা যাইতাছেন, নোট ফোট রাখবার লইছেননি?

আমি বললাম, নোট রাখার বিশেষ অভ্যাস নেই। তার একটা কারণ মনে রাখার মতো কিছু চোখে পড়লে মনের ভেতর গেঁথে যায়। সে সময় আমার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিলো।

স্যার বললেন, নোট রাখার অভ্যাসটি করলে ভালা অইত। কথা প্রসঙ্গে ড. আনিসুজ্জামানের নাম উল্লেখ করলেন। আনিস যেমন পরিচ্ছন্ন গবেষণার কাম করে; সেরকম বেশি দেখা যায় না।

স্যার তখন একের পর এক বই তুলে দিচ্ছিলেন আর আমি পড়ে যাচ্ছিলাম। তিনি কেনো আমাকে দিয়ে ওইসব ছাইপাশ পড়িয়ে নিচ্ছিলেন, আমি কেনো পড়ে যাচ্ছিলাম, তার কারণ আমি আজও খুঁজে বের করতে পারিনি। এইভাবে প্রায় সাত মাস চলে গেল। থিসিসের কাজ পড়ে আছে। সে সময়ে আমার মনোভাব ছিল এরকম, এতসব প্রয়োজনীয় বিষয় আমি জানতে পারছি, থিসিস লেখার কাজে নষ্ট করার সময় কই? স্যার আমাকে দিয়ে অনেক কিছু পড়িয়েছেন। কিন্তু পড়ে কী লাভ হয়েছে খতিয়ে দেখার সময় হয়নি। দৃশ্যত অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে অধিক মনোসংযোগ করার কারণে আমি ভেতরে ভেতরে অনেকখানিই বদলে গিয়েছিলাম। তার ফল হয়েছে এই যে, সাহিত্য যাঁরা করেন তাঁদের সঙ্গে পুরোপুরি মিশতে পারিনি এবং সমাজবিজ্ঞানীদের দলেও ভিড়তে পারিনি। সেই যে দুই পা দুই নৌকায় রাখতে অভ্যাস করিয়েছিলেন রাজ্জাক স্যার, অদ্যাবধি আমার পক্ষে এক করা সম্ভব হয়নি।

সাত

কিছুকাল আগে প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতা কমরেড আবদুল হক 'পূর্ববাংলা আধা সামন্ততান্ত্রিক, আধা ঔপনিবেশিক' এই শিরোনামে একটি নাতিক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখেছিলেন। পুরো ষাটের দশক, এমনকী সত্তর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই পুস্তিকাটি বামপন্থী রাজনৈতিক নেতা এবং বুদ্ধিজীবীদের কিছুটা প্রভাবিত করেছিল। কমরেড আবদুল হক চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা কমরেড মাও সে তুং চীনাসমাজের যে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাটি দাঁড় করিয়েছিলেন সেই লাইন অনুসরণ করে এই ব্যাখ্যাটি দাঁড় করিয়েছিলেন। র‍্যাডিক্যাল অর্থনীতিবিদ বলে খ্যাত ড. আবু মাহমুদের মতো মানুষও আবদুল হকের ব্যাখ্যাটি সঠিক প্রমাণিত করে একাধিক রচনা প্রকাশ করেছেন। আমার কাছে এই ব্যাখ্যাগুলো হেঁয়ালির মতো মনে হচ্ছিলো। অন্যদিকে মানবেন্দ্রনাথ রায় 'ইন্ডিয়া ইন ট্রানজিশন' গ্রন্থে যে পদ্ধতিতে ভারতীয় সমাজের ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছিলেন সেটা আমার কাছে অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে হচ্ছিলো। কিন্তু আমি সামান্য মানুষ। এই সমস্ত বিষয়ে কোনো মতামত প্রদান করা কিংবা মতামত সত্যি বলে মেনে নেয়া কোনোটাই সম্ভব ছিল না।

একদিন বিকেলবেলা রাজ্জাক স্যারের কাছে গিয়ে বিষয়টি উত্থাপন করলাম। বললাম, স্যার, বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক অবস্থান কোথায়? এটা আধা–সামন্ততান্ত্রিক সমাজ একথা কি সত্যি?

স্যার বললেন, আপনে একটু বয়েন। তিনি বাথরুমে গেলেন। এসে গামছা দিয়ে দুপায়ের পানি মুছে যুত হয়ে বসলেন। একটা চুরুট ধরিয়ে খকখক করে কাশলেন। তারপর বললেন, ইন দ্যা স্ট্রিকটেস্ট সেন্স অভ দ্যা টার্ম ইন্ডিয়াতে কোনো ফিউডালিজম আছিল না। বেঙ্গলের কথা ত এক্কেরে আলাদা। বেঙ্গলের কথায় পরে আইতাছি। তার আগে রেস্ট অভ দি ইন্ডিয়ার খবর লই। ফিউডালিজম অইল একটা ক্লোজড সিস্টেম। বংশপরম্পরা একটা পরিবার স্থায়ী অইয়া একটা জায়গায় বাস করব। তার ধোপা, নাপিত, কামার, কুমার সব আলাদা। এক জায়গার মানুষ অন্য জায়গায় যাইবার পারব না। কাঁঠালের যেমন কোয়া ফিউডাল সিস্টেমে সামন্তের জমির সঙ্গে সকলের তেমন সম্পর্ক। সামন্তরা অইল নিজের জমিদারিতে সমস্ত দণ্ডমুণ্ডের মালিক। রাজসভায় ঠিকমতো হাজিরা দিতে পারলে আর যুদ্ধের সময় ঠিকমতো সৈন্য পাঠাইবার পারলে এক্কেরে সাত খুন মাফ। ইন্ডিয়াতে মোগল আমলের কথা ধরেন, জমিদারি এখানে বংশানুক্রমিক আছিল না। সম্রাট ইচ্ছা করলে জমিদারের পোলারে জমিদার নাও বানাইতে পারতেন। আর যদি বেঙ্গলের কথায় আইয়েন, তাইলে এক্কেরে অন্য কথা বলতে অয়। পুরানা বাংলা পুঁথিতে দেখা যায় বাংলার বাণিজ্যবহর জাভা সুমাত্রা এইসকল অঞ্চলে যাওয়া–আসা করছে। যেখানে বাণিজ্য এইরকম সচল থাকে সেই সমাজটারে অন্য যা ইচ্ছা কইবার চান কন, কিন্তু ফিউডালিজম বলবার পারবেন না। ভিটফোগেলের হাইড্রোলিক থিয়োরি বেঙ্গলের বেলায় এক্কেরে খাটে না।

আমি বললাম, তা হলে বেঙ্গলের সমাজের নেচারটা কী?

স্যার বললেন, যা ইচ্ছা কন, কিন্তু ফিউডালিজম কইবার পারবেন না। ইন্ডিয়ার অন্যান্য প্রোভিন্সে যেটুকু ফিউডালিজমের চিহ্ন খুঁইজ্যা পাওন যায়, বেঙ্গলে তার ছিটাফোঁটাও পাইবেন না। গ্রামগুলার ফরমেশন দেখলেই বুঝতে পারবেন। এইখান থেইক্যা বিহারে যান, দেখবেন সীন এক্কেরে পালটাইয়া গেছে। ফিউডালের অবস্থানের চাইর পাশে গোটা গ্রামবাসীর বসবাস। বেঙ্গলে সেইসব আপনে পাইবেন না। আপনে কি মনসামঙ্গলের চাঁদ সওদাগরের কাহিনী পড়ছেন?

আমি বললাম, একসময় বাংলা সাহিত্যের ছাত্র ছিলাম, সেই সুবাদে বাধ্যতামূলকভাবে পড়তে হয়েছে।

তা অইলে চাঁদ সওদাগরের কাহিনী আপনের জানা। বেবাক বাংলা সাহিত্যে এইরকম শিরদাঁড়ার মানুষ একটাও দেখছেন? আমি বললাম, না, চাঁদ সওদাগরের মতো শক্তিশালী চরিত্র বাংলা সাহিত্যে একেবারে বিরল। মাইকেলের মেঘনাদকেও চাঁদ সওদাগরের পাশে ম্লান দেখায়।

স্যার বললেন, চাঁদ সওদাগর চরিত্রের এই যে ঋজুতা এইডা অইল সমুদ্র–বাণিজ্যশক্তির প্রতীক।

আমি আমার মূল প্রশ্নে ফিরে গেলাম, উনারা যে বলছেন, পূর্ববাংলা আধা–সামন্তবাদী আধা–উপনিবেশবাদী।

স্যার ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বললেন, ওরা যদি গায়ের জোরে কইবার চায় আপনে কী করবেন, মারামারি করবেন নিহি?

কিছুদিন পর এক সকালে গিয়ে দেখি নিয়াজ মোর্শেদ বসে আছে। তার সঙ্গে স্যার ড. কাজী মোতাহের হোসেনের গল্প বলছেন। কাজী কোথায় গিয়ে কী কারণে জানি আটকা পড়ে গিয়েছিলেন, দেশে ফেরার পথে তিনি ক্লাবে এসে রাজ্জাক স্যারের খোঁজ করেছিলেন। কিন্তু নামটা ভুলে গেছেন। স্যার ঘটনাটা এইভাবে বললেন, আপনেরা ছেলেটারে দেখছেননি? সকলে জানতে চাইলেন, স্যার, আপনি কোন্ ছেলেটার খোঁজ করছেন? মোতাহের সাহেব বললেন, সেই ছেলেটা কী যেন নাম। নাকি দাড়িদাড় রাইখ্যা বেশ কাপ্তেন অইছে। কে একজন বললেন, স্যার, আপনি কি রাজ্জাক সাহেবের কথা বলছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, তার নাম আবদুর রাজ্জাক। এতক্ষণে মনে পড়ছে। একথা বলে স্যার খুব করে হাসলেন। তারপর রাজ্জাক স্যার কাজী মোতাহের হোসেন সাহেবের আরেকটা গল্প বললেন। রাজ্জাক স্যার তখন ছাত্র। মোতাহের হোসেন সাহেব স্ট্যাটিসটিকস্ ডিপার্টমেন্টে ডেমোনেস্ট্রেটর না লেকচারার। তিনি দাবাখেলার পার্টনার খুঁজে বেড়াতেন। সবসময় কিন্তু পার্টনার পাওয়া যাইত না। বাধ্য অইয়া কাজী সাহেবকে কলতাবাজার যাইতে অইত। কশাইগো মধ্যে দুয়েক জন ভালো প্লেয়ার আছিল। কাজী সাহেব তাগো লগে বইয়া যাইতেন। একবার খেলতে বইলে দিন রাইতের খবর থাকত না। একবার অইল কী, আমি উনার ডিপার্টমেন্টে খোঁজ নিতে গেলাম উনি ফ্রি আছেন কি না দেখতে। দেখলাম তিনি ব্ল্যাকবোর্ডে ছাত্রদের অঙ্ক বুঝাইতেছেন। আমারে দেহামাত্রই বাইরে আইস্যা মৃদুস্বরে কইলেন, তুমি একটু পরে আইয়ো। এই ক্লাসটার পরে তোমার সঙ্গে বসা যাইব। কিছুক্ষণ পর আমি যখন গেলাম ততক্ষণে ক্লাস শেষ অইয়া গেছে। তিনি সাইকেলসহ আমারে সঙ্গে কইরা সেগুনবাগিচার বাড়িতে গেলেন। সাইকেলটা হেলাইয়া রাইখ্যা দাবার বোর্ড লইয়া বইলেন। দুই দান খেলা শেষ

অইছে। আমি কইলাম, বেলা পাঁচটার পরে আমার চইল্যা যাওন লাগব। পাঁচটার পর কারফিউ। তখন ওঅর টাইম। কাজী সাহেব কইলেন যখন যাইবা তখন ত যাইবা। অখন বোর্ড সাজাও। বাধ্য অইয়া খেলতে লাগলাম। রাইত নটার সময় খেলা শেষ কইর‍্যা কইলেন, এখন তুমি কেমনে যাইবা? আমি কইলাম, কারফিউর মধ্যে আমি কেমনে যামু? উনি কইলেন, হেইডা একটা কথা। তুমি এখন কী করবা, এইহানে শুইয়া থাকতে পারবা? লজ্জায় কইলাম, ঠিক আছে শুইয়া থাকুমনে। কাজী সাহেব ত উপরে উইঠ্যা গেলেন। আমি ঘুমাইতে চেষ্টা করলাম। কিছুতেই ঘুম আসে না। একে ত পেটে দানাপানি কিছু পড়ে নাই, তারপর এত বড় বড় বাদুরের মতো মশা। সারা শরীর এক্কেরে রক্তাক্ত কইর‍্যা ফেলাইছে। এর মধ্যেও চোখ বন্ধ কইর‍্যা পইড়া রইছি। আধা রাইত পরে উপর থেইক্যা নাইম্যা কাজী সাহেব আমারে ডাকতে আরম্ভ করল, আবদুর রাজ্জাক, এ্যাই আবদুর রাজ্জাক, তুমি ঘুমাইয়া পড়ছ নিহি। আমি উইঠ্যা কইলাম, না স্যার, আমি জাগনাই আছি। তোমার একটু উপরে আওন লাগে। আমি অবাক অইয়া কইলাম, কেন্ স্যার? তোমারে উপরে ডাকতে আছে।

আসল ঘটনাটি এরকম। রাজ্জাক স্যার আওয়াজ করে মশা মারছিলেন এবং খুব কাশছিলেন। কাশির শব্দ শুনে বেগম সাহেবার ঘুম ভেঙে যায়। তিনি কাজী সাহেবকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বললেন, নিচে কে একটা কাশছে, দেখে এসো। কাজী সাহেব বললেন, দেখে আসার দরকার নেই। ওটা আবদুর রাজ্জাক। দাবা খেলতে এসে আটকা পড়ে গেছে। পাঁচটার পর কারফিউ। যেতে পারেনি। বেগম সাহেব জানতে চাইলেন, একটা মানুষ নিচে রেখে এসেছেন, তার ভাতপানি কিছুর দরকার আছে একথা আপনার মনে ছিলো না। কাজী সাহেব জানালেন, না, সে কথা আমার বিলকুল মনে আসেনি। বেগম সাহেব চটে গিয়ে বললেন, যান এখুনি উপরে ডেকে নিয়ে আসেন। বেগম সাহেবের ধাতানি খেয়ে রাজ্জাক সাহেবকে ওপরে ডাকতে এসেছেন।

মাঝখানে স্যার একবার সপরিবারে ভারতে গিয়েছিলেন। আমি যখন শুনলাম তাঁরা কাশ্মীর যাবেন, হঠাৎ ইচ্ছা জাগলো স্যারকে আমার জন্য একটা শাল আনতে বলি। বললামও। স্যার বললেন, আর কোনো জিনিস আপনের দরকার নিহি? আমি বললাম, যদি আপনি বইয়ের দোকানে যাওয়ার সুযোগ পান। ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রের একটা নির্ভরযোগ্য ইতিহাস আনবেন আমার জন্য। আমি ধরে নিয়েছিলাম স্যার ভুলে যাবেন। প্রায় আড়াই সপ্তাহ পরে ক্লাবের সামনে স্যারের সঙ্গে দেখা। স্যার ফিরে এসেছেন আমি কোনো সংবাদ পাইনি। আমি অবাক হয়ে বললাম, স্যার কখন ফিরলেন?

বললেন, আজ বেয়ানের ফ্লাইটে। মৌলবি আহমদ ছফা আপনে কেমন ছিলেন?

আমি বললাম, ভালো স্যার।

কাইল বেয়ানে আপনে একবার আয়েন।

পরদিন সকালবেলা আমি স্যারের কাছে গেলাম। স্যার বললেন, চলেন নাস্তা খাই। নাস্তা খাওয়ার পর স্যার আমার হাতে সত্যি সত্যি ঘিয়ে রঙের একটা কাশ্মিরী শাল তুলে দিলেন। আমি কী যে খুশি হয়েছিলাম! আমি স্যারকে দেখাবার জন্য চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিচ্ছিলাম, নিচের সিঁড়িতে দুজন শিক্ষকের গলার আওয়াজ পাওয়া গেলো। স্যার তাঁদের কণ্ঠস্বর শুনেই বললেন, চাদরটা ওইদিকে থুইয়া দ্যান। আমি স্যারের কথা বুঝতে পারিনি। তিনি তাড়াতাড়ি উঠে আমার গা থেকে চাদরটা টেনে নিয়ে বিছানার দিকে ছুড়ে দিলেন। স্যারের এই আচরণে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না আমার বেয়াদবিটা কোথায় হয়েছে। আমার ইচ্ছা হচ্ছিলো একদৌড়ে পালিয়ে আসি। স্যার বোধহয় আমার মনোভাবটা বুঝে ফেললেন, মৌলবি আহমদ ছফা যায়েন না, আপনের লগে একটু কথা আছে।

স্যার এই দুই শিক্ষক ভদ্রলোকের সঙ্গে পূর্ণিমাচাঁদের গল্প করতে আরম্ভ করলেন। কথা আর ফুরোয় না। আমি বসে বসে উসখুস করছিলাম। অবশেষে তাঁরা বিদায় হলেন। স্যার বিছানা থেকে শালখানা কুড়িয়ে নিয়ে আমার কাঁধের ওপর রেখে দিয়ে বললেন, কিছু জিনিস কাউরে অন্য মাইনষের সামনে দিলে মনে কষ্ট পাইতে পারে। তারপর তিনি কলকাতা থেকে আনা বইয়ের পুঁটুলিটা খুলে আমার হাতে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য না বসু (মনে নেই, পদবিটা কী) লিখিত দ্যা হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিক বইটি আমার হাতে দিলেন। আমার ভাবতে খুবই আফসোস হয়, স্যারের দেয়া দুটি উপহারের কোনোটাই আমি সংরক্ষণ করতে পারিনি। একবার খাটের ওপর অ্যাশট্রেতে জ্বলন্ত সিগারেট রেখে আমি ইন্টারন্যাশনাল হোস্টেলের বাইরে গিয়েছিলাম। পাখাটি বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলাম। রাত বারোটার সময় বাইরে থেকে এসে দেখি ঘর ধোঁয়ায় ভরে গেছে। ফ্যানের বাতাসে অ্যাশট্রে থেকে সিগারেটের আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়ে অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়েছে। চাদরটাও গেছে। ক্লাসিক্যাল মিউজিকের হিস্ট্রিটা এক ভদ্রলোককে ধার দিয়েছিলাম। বইটা ফেরত আনা যাতে অসম্ভব হয় সেজন্য ভদ্রলোক কায়দা করে ভবলীলা সাঙ্গ করেছিলেন।

কয়েকদিন পরে সকালবেলা স্যারের বাড়িতে গিয়ে দেখি পরিবারের সকলে নাস্তার টেবিলে এসে বসেছেন। সকলে ঈষৎ উত্তেজিত। লক্ষ করলাম সেটা

স্যারকেও একটুখানি স্পর্শ করেছে। গতোরাতে শিল্পী কামরুল হাসান টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে শিল্পী জয়নুল আবেদীনের বিষয়ে কী একটা মন্তব্য করেছেন, যা স্যারের পরিবারের প্রায় সকলের কাছেই নিষ্ঠুর বলে মনে হয়েছে। এ নিয়ে সকলে কথা–বলাবলি করছিলেন। স্যার কোনো মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকলেন। নাস্তা খাওয়ার পর স্যার যখন তাঁর ঘরে এলেন, আমি জিগ্‌গেস করলাম, স্যার, আপনি কি মনে করেন জয়নুল আবেদীন খুব বড় শিল্পী?

তিনি সরাসরি আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে একটি গল্পের অবতারণা করলেন। একসময়ে এক ইংরেজ ভদ্রলোক, পেশায় যিনি বিলেতের কোনো একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিশেষ উপলক্ষে ঢাকা এসেছিলেন। স্যার বললেন, সেই সায়েবরে আমি ঢাকা শহর ঘুরাইয়া দেখাইতে আছিলাম। শহর দেখানোর কাজ যখন শেষ, আমি কইলাম, চলেন আপনেরে একজন শিল্পীর কাছে লইয়া যাই। উনি কইলেন, আই উড লাভ টু। তারপর সায়েবরে লইয়া শান্তিনগরে আবেদীন সাহেবের বাড়ি গেলাম। আবেদীন সাহেব হবায় দুইখানা ওয়াটার কালার আঁইক্যা শেষ করছেন। এই ওয়াটার কালার দেইখ্যা ত সাহেবের চক্ষু ছানাবড়া। আমার কানের কাছে মুখ আইন্যা কইলেন, এই ছবিগুলার দাম কত অইব আপনে ধারণা করতে পারেন? আমি জিগাইলাম, আপনি কি ছবি কিনবার চান? সায়েব কইল, আমি একজন গরিব মাস্টার। এইরকম অপূর্ব ছবি কিনার টাকা আমি কই পামু? তারপর আমি আবেদীনের লগে কথা কইলাম। তিনি একেকটা ছবির জন্য মাত্র তিনশ টাহা দাম চাইলেন। লগে লগে মানিব্যাগ খুইল্যা ছয়শ টাহা দিলেন সায়েব। ছবি দুইটা যখন বগলের তলায় লইয়া ফির‍্যা আইবার লাগছিল, তারে খুব খুশি দেখাইতে আছিল। আমারে কইল এক তাল সোনা কুড়াইয়া পাইলেও আমি এত খুশি অইতাম না।

গল্পটা শেষ করার পর আমার দিকে তাকিয়ে একটুখানি হাসলেন এবং বললেন, আপনেরা ত এখন নানারকম ছবি দেখেন। জয়নুল আবেদীন ছবিতে যেভাবে স্পেসের ব্যবহার করেন, এরকম কাউরে করতে দেখছেন? পাল্কির ছবিটা দেখবেন, বেহারাগুলার মাঝখানে যে ফাঁক সেইটা ভালো কইর‍্যা তাকাইবেন। বেহারাদের পরস্পরের মধ্যে যে দূরত্ব সেইটা এইদিক ওইদিক একটু বেশকম অইলেই কিন্তু ছবিটার আবেদন কইম্যা যায়।

সাহেব অধ্যাপকের কথা যখন উঠলো, আমি সাহস করে জিগ্‌গেস করলাম, স্যার, আপনার সঙ্গে কি করে ডিক উইলসন সাহেবের পরিচয় হলো? আপনি কি তাঁকে বিলেত থেকেই চিনতেন?

রাজ্জাক স্যার মাথা নাড়লেন, উনার সঙ্গে আমার ঢাকাতেই পরিচয়। তিনি ল–এর মানুষ। কথাবার্তা শুইন্যা মনে অইল বেশ লেহাপড়া জানে। জিগাইলাম, এইখানে আমাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টারি করবার চান নিহি। উইলসন সায়েব কইলেন, আমি চাইলেই কি মাস্টারি করতে পারি? আমাকে চাকরি দেয় কে? আমি লগে লগে ভাইসচ্যান্সেলর মুয়াজ্জেম সায়েবের সঙ্গে দেখা কইর‍্যা কইলাম হিয়ার ইজ অ্যান আউটস্ট্যান্ডিং পারসন, তারে চাকরি দিলে ইউনিভার্সিটি উইল বি বেনিফিটেড। মোয়াজ্জেম সাব তার চাকুরি দিতে রাজি অইলেন। আমি কইলাম, আপনে অখনই দরখাস্ত করেন। দরখাস্ত করলেন। বাস চাকুরি অইয়া গেল। ছ'মাসের বেশি আছিলেন না। আমি উইলসন সাবরে এশিয়া অঞ্চলের প্রতি দৃষ্টি দেওনের জন্য ইনস্পায়ার করছিলাম। তিনি এই অঞ্চলে বিস্তর ঘোরাঘুরি করছেন। বইটা পড়লেই টের পাইবেন। স্যার বললেন, আরও একজন ইন্টারন্যাশনালি ফেমাস মানুষ আমাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন মাস্টারি করেছিলেন, সেই ভদ্রলোক ইংরেজ নন, ফ্রেন্স।

আমি জানতে চাইলাম, স্যার আপনি নিশ্চয়ই তাঁর নাম মনে রেখেছেন?

স্যার তাঁর দাড়ির গোছাটাতে হাত বুলিয়ে বললেন, নাম মনে থাকব না ক্যান? তাঁর নাম ক্লদ লেভি স্ট্রস।

একদিন সকালবেলা স্যার তাঁর ছোটোবেলার স্মৃতিচারণ করছিলেন, আমরা যখন ছোড আছিলাম, হেই সময়ে গাঁও গেরামে উঁচা লম্বা একধরনের শালপ্রাংশু চেহারার মানুষের দেখা পাওয়া যাইত, এখন পাঁচ গ্রাম বিচরাইলেও সেইরকম বলিষ্ঠ চেহারার মানুষ পাওন যায় না। আমি জিগ্‌গেস করলাম, কারণ কী?

স্যার হুঁকোর নলটা ঠোঁটের কাছে ধরে কী একটা চিন্তা করলেন, তারপর বললেন, পুষ্টিকর খাবারের দুস্প্রাপ্যতাই মানুষের স্বাস্থ্যহানির আসল কারণ। আগে গ্রামে অঢেল খাদ্যদ্রব্য পাওন যাইত। অখন যায় না। নদীনালা বিলে হাত দিলেই মাছ পাওন যাইত। এখন একরকম অদৃশ্য অইয়া গেছে। মাইনষে খাইব কী। আগের নদীও কি এখন আছে! পূর্বের দিনে ঢাহা শহর থেইক্যা আমাগো গ্রামে যাইতে অইলে তিন জাগায় নদী পার অওন লাগত। এইবার যাইয়া নদীর দেখাও পাইলাম না। বেবাক খটখট্যা শুকনা। নদী কই সইর‍্যা গেছে। তারপর রাজ্জাক স্যার তাঁর ছেলেবেলার এক মধুর স্মৃতির কথা উল্লেখ করলেন। আমাগো ছোডবেলায় বাড়ির পেছনে একটা লম্বা বরই গাছ আছিল। শীতকালে টিনের চালের থেইক্যা নিচে মাটিত টুপটুপ কইর‍্যা শিশিরের ফোটা ঝইর‍্যা পড়ত। সারারাত গাছ থেইক্যা পাকনা বরই পয়লা চালের ওপর, তারপর মাটিতে আইস্যা পড়ত। আমরা আধ ঘুমের মধ্যেও টের পাইতাম, বরই পড়তাছে।

আমি বললাম, বেঠোফেনের মুন লাইট সোনাটায় এইরকম ব্যাপার আছে। শুনলে মনে হবে আপনি টুপটাপ শিশির ঝরার শব্দ শুনছেন।

স্যার হঠাৎ আমাকে প্রশ্ন করলেন, আপনে কি আবদুল করিম খান সাহেবের গান শুনছেন? আমি বললাম, একটামাত্র লং প্লেয়িং রেকর্ড ঢাকায় পাওয়া যায়। সেটি শুনেছি।

স্যার আমার প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করে বললেন, করিম খান সাহেবের কণ্ঠে দানাদার মিছরির মতো একটা মিষ্টি স্বাদ আছে। অন্য কোনো গায়কের কণ্ঠে সেই জিনিস আপনে পাইবেন না। গান–বাজনার কথা যখন উঠলোই, আমি চাইছিলাম স্যার এ বিষয়ে আরও কিছু কথাবার্তা বলুন। তিনি বলে যেতে থাকলেন, মেগাফোন না হিজ মাস্টার্স ভয়েস মনে নাই, একসময়ে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান সাহেবের এক বা একাধিক বেহালার রেকর্ড বাইর করছিল। সেইসব জিনিস এখন আর পাওন যায় না। আমি জানতে চাইলাম আর কার কার গান বাজনা আপনার ভালো লাগে। স্যার একটু হাসলেন। আমাগো সময় আর আপনেগো সময়ের টেস্ট এক না। অনেক কিছু পালটাইয়া গেছে। আমি গিরিজা দেবীর গান খুব পছন্দ করতাম, ফৈয়াজ খাঁ সায়েবের গান খুব ভালো লাগত।

স্যারের কাছ থেকে গীবনের ডেক্লাইন অ্যান্ড ফল অব দ্যা রোমান এম্পায়ার বইটি আমি ধার এনেছিলাম। শেষ করার পর বইটি যখন ফেরত দিতে গেলাম, দেখি স্যার বসে বসে জনসন সাহেবের লাইভস অব দ্যা ইংলিশ পোয়েটস বইটা খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ছেন। আমাকে দেখে বললেন, বয়েন মৌলবি আহমদ ছফা। আমি জানতে চাইলাম, বইটা কি খুব ভালো?

স্যার বইটি বন্ধ করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ওহ্ ভেরি ভেরি মাচ ওয়েল রিটেন। জনসন সাহেব ভীষণ প্রিসাইজ। বাংলা ভাষায় এইরকম একখান বই লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত। আমি গীবনের বইটি ফেরত দিলে তিনি বললেন, ডেক্লাইন অ্যান্ড ফল অব দ্যা রোমান এম্পায়ার আপনে কি আগাগোড়া পড়ছেন?

আমি বললাম, স্যার একরকম পড়েছি।

স্যার বললেন, একটা জিনিস কি লক্ষ করছেন?

আমি বললাম, কোন জিনিসটা?

স্যার বললেন, গোড়ার দিকে রোমের যেসব মানুষ খ্রিস্টান অইছিল, তারা আছিল মোস্টলি প্লিবিয়ান অ্যান্ড পার্সিকিউটেড। একসময়ে তাগো সংখ্যা যখন বাইড়্যা গেল এম্পারার জাস্টিনিয়ান রাজ্যরক্ষার প্রয়োজনে নিজেই খ্রিস্টান অইয়া গেলেন। প্যালেস্টাইনের খ্রিস্টান ধর্ম আর রোমের খ্রিস্টান ধর্ম এক জিনিস নয়।

রোমের প্যাট্রিসিয়ান খ্রিস্টান এবং প্লিবিয়ান খ্রিস্টানের মধ্যবর্তী সাইকোলজিক্যাল ডিসট্যান্স অনেকদিন পর্যন্ত টিইক্যা আছিল। এই জিনিস আপনে বেঙ্গলের মুসলমানদের মধ্যেও পাইবেন। আশরাফ মুসলমান এবং আতরাফ মুসলমানদের মধ্যে আপনে খুব অল্পই কমন জিনিস খুঁইজ্যা পাইবেন। তবে মুসলমানদের আশরাফ বইন্যা যাইতে বেশি সময় লাগে না। দুধ ঘি ঠিকমতো খাইলেই অ্যারিস্টোক্রেট বইন্যা যায়। যেমন গনি মিয়া মানে আবদুল গনির কথাই ধরেন–না! তার সম্পর্কে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট,—স্যার একজন সাহেবের নাম বললেন, (যা আমি মনে রাখতে পারিনি) লেইখ্যা গেছেন গনি মিয়া খুব ভালা হার্মনিয়াম বাজাইতে পারতেন। আর কিছু না। গনি মিয়ার বংশধরেরা ত নতুন অ্যারিস্টোক্রেট হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাইয়া গেছিল। এই গনি মিয়ারে জাতে তোলার লাইগ্যা মওলানা ওবায়দুল্লাহ্ অনেক কলকাঠি নাড়াইছেন। মওলানা ওবায়দুল্লাহ্ই আছিলেন ঢাকা মাদ্রাসার শিক্ষক আর গনি মিয়ার চামচা। আবার এই ওবায়দুল্লাহ্ই আছিলেন আপনেগো নেতা হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দির … (দাদা না নানা কী বলেছিলেন আমার মনে নেই।) তারা আছিলেন মেদিনীপুরের মানুষ। সোহরওয়ার্দি টাইটেলটা সেই সময়ে ওঁরা কেউ ব্যবহার করতেন না।

এরই মধ্যে স্যার একবার উঠে বাথরুমে গেলেন। ফিরে এসে গামছা দিয়ে হাত–পা মুছলেন। হুঁকোতে টান দিয়ে আমাকে জিগ্‌গেস করলেন, কী য্যান কইতে আছিলাম?

আমি মনে করিয়ে দিলাম তিনি ঢাকার গনি মিয়ার পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ডের কথা বলছিলেন। স্যার বললেন, তার ত কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড আছিল না। ঢাকার অ্যারিস্টোক্রেটরা গনিমিয়ার পরিবারের লগে কোনোরকমের বৈবাহিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতেন না। সলিমুল্লাহ্ মামলায় ঠেকাইয়া এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিয়া করছিলেন। কিন্তু সলিমুল্লাহরে বেগম সাহেবের বেডরুমে যাওনের সময় পারমিশন লইয়া যাওন লাগত। যেনো নিষিদ্ধ বিষয়ে মন্তব্য করে ফেলেছেন সেজন্য তাঁর চোখেমুখে একটা লজ্জার আভা দেখা গেল।

আমি আলোচনাটাকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করার জন্য বললাম, স্যার, খোন্দকার ফজলে রাব্বি দ্যা ওরিজিন অভ দ্যা বেঙ্গলি মুসলমানসর নামে একটি বই লিখেছিলেন এবং সাম্প্রতিককালে বইটির একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। স্যার বললেন, খোন্দকার ফজলে রাব্বি আছিলেন মুর্শিদাবাদের নওয়াবগো দেওয়ান। একোনমিস্ট রেহমান সোবহান আছেন না, তাঁর নানা। তথ্যটা আমার জানা ছিল না। আমি স্যারকে সোজাসুজি প্রশ্ন করলাম, খোন্দকার সাহেব লিখেছেন বেঙ্গলের মুসলমানদের বেশিরভাগই বহিরাগত মুসলমানদের

বংশধর। একথা কী করে সত্যি হতে পারে? দেখলাম, ও বিষয়ে স্যারের আলোচনা করার বিশেষ আগ্রহ নেই। স্যার সম্পূর্ণ নতুন একটি বিষয়ের অবতারণা করলেন। সংস্কৃতির আরবি প্রতিশব্দ তমদ্দুন। তমদ্দুন শব্দটি এসেছে মদিনা থেকে।

মদিনা শব্দের অর্থ অইল গিয়া শহর। ইসলামের লগে শহরের একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে।

আমি স্যারের মতামতটাকে যথাযথভাবে গ্রহণ করতে পারছিলাম না। তাই বললাম, এ বিষয়ে আমি বিশেষ জানি না। তথাপি আমার মনে হয় বেঙ্গলের ক্ষেত্রে একথা বোধ করি সত্যি নয়। বেঙ্গলের গ্রামেই মুসলমানের সংখ্যা বেশি।

স্যার বললেন, সেকথা ঠিক, কিন্তু সূচনাটি অইছিল শহরে, গৌড়, পাণ্ডুয়া, সোনার গাঁ, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ এর সবকটাই আছিল সীট অব পলিটিক্যাল পাওয়ার।

খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করার পর রোমের প্লিবিয়ান এবং পেট্রিসিয়ানদের নতুন একটা বিভাজন–রেখার সৃষ্টি হয়েছিল। এই ধরনের একটা প্রায় অলঙ্ঘনীয় বিভাজন–রেখা বেঙ্গলের মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যেও ক্রিয়াশীল রয়েছে। স্যারের এই কথার মধ্যে আমি একটা গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পেয়ে যাই। আমি বিষয়টি নিয়ে ভাবতে শুরু করি। সেই সময়ে জিয়াউর রহমান দেশের প্রেসিডেন্ট। আবুল ফজল ছিলেন জিয়া সাহেবের শিক্ষা এবং সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা। তিনি আমাদের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন এবং তাঁকে আমরা মান্য করতাম। একদিন সকালবেলা দেখতে পেলাম আবুল ফজল সাহেব মাথায় টুপি দিয়ে অপর এক উপদেষ্টা এম এ জি তাওয়াবের সঙ্গে রমনা ময়দানের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। আমি সালাম দিয়ে ফজল সাহেবকে জিগ্‌গেস করলাম, কোথায় যাচ্ছেন। তিনি জানালেন, তাওয়াব সাহেবের সঙ্গে সিরাতের মজলিসে যাবেন। আমি ভীষণ একটা ধাক্কা খেয়েছিলাম। আবুল ফজল সাহেব নাস্তিকতা প্রচার করতেন। ক্ষমতার কাছাকাছি এসে দেখছি তিনিও নবীভক্ত হয়ে পড়েছেন। এই ঘটনাটি আমাকে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করে। রাজ্জাক স্যার রোমের প্লিবিয়ান খ্রিস্টানদের মনন মানসিকতার বিষয়ে যে ইঙ্গিত করেছিলেন, আমার মনে হল, সেই দোলাচল মনোবৃত্তিটা বাঙালি মুসলমানের মনেও কাজ করে যাচ্ছে। মুসলিম রচিত পুঁথিসমূহের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বাঙালি মুসলমানের চৈতন্যের একটি দিক আমি উদ্‌ঘাটন করতে চেষ্টা করেছিলাম। আমার রচনাটির শিরোনাম ছিল 'বাঙালি মুসলমানের মন'। লেখাটি মাসিক সমকালে প্রকাশিত হয়েছিল। লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার পরপরই একটা তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

আমি বাঙালি মুসলমানদের বেশিরভাগকেই নিম্নবর্ণের হিন্দুদের বংশধর বলে মস্ত অপরাধ করেছি, এ অভিযোগ করে নানা পত্রপত্রিকায় প্রতিবাদ ছাপা হতে থাকে। আমাদের দেশে এক শীর্ষস্থানীয় কবি ছদ্মনামে তিনটি প্রবন্ধ আমাকে গালাগাল করে লেখেন। প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির তৎকালীন সভাপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ সাপ্তাহিক ইত্তেহাদ পত্রিকায় আমার বিরুদ্ধে পুরো ছয় মাস ধরে গালমন্দ করে নিবন্ধ লিখতে থাকেন। পরে ওই নিবন্ধগুলো পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করে সর্বত্র বিলি করতে আরম্ভ করেন। শুক্রবারে জুমার নামাজের পর সমবেত মুসল্লিদের মধ্যে তাঁর পুস্তিকাটি বিনামূল্যে বিতরণ করে জনমতকে খেপিয়ে তোলার চেষ্টা করতে থাকেন। আজাদ সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যেও তাঁর পুস্তিকাটি বিতরণ করেছিলেন। রাজ্জাক স্যারের হাতেও একটা কপি এসেছিল। আমার লেখাটিও স্যারকে দিয়েছিলাম। আমার লেখাটি সম্পর্কে স্যারের মতামত জানার চেষ্টা করিনি। আমার ধারণা ছিল কোনো একটা সময়ে স্যার তাঁর নিজের মতামত আমাকে জানাবেন। সারাদেশে তুমুল বিতর্ক চলছে। বেশিরভাগ মানুষ আমাকে সমর্থন করছেন। যাঁরা বিরোধিতা করছেন, তাঁদের সংখ্যাও অল্প নয়। সবচেয়ে মুশকিলের ব্যাপার হল, এই লেখাটিকে উপলক্ষ করে যে-কেউ একটা সামাজিক উত্তেজনা জাগিয়ে তুলতে পারে, আর সেরকম মানুষের সংখ্যা অল্প নয়।

একদিন বাড়িতে যেয়ে রাজ্জাক স্যারকে জিগ্‌গেস করলাম, স্যার, আপনি আবুল কালাম আজাদের পুস্তিকাটি কি পড়েছেন?

স্যার বললেন, হ দেখছি, ওর মধ্যে পড়নের কিছু নাই। বেবাকটাই নির্জলা গালাগালি। এর বেশি কিছু করনের ক্ষমতা আবুল কালামের নাই।

আমার নিজের লেখাটির ওপর চোখ বুলোবার সুযোগ কি আপনের হয়েছে?

স্যার বললেন, আপনের লেখাটাও পড়ছি। উনিশ'শ তিরিশ সালের দিকে প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের বর্তমান 'হিন্দু মুসলমান সমস্যা'র পর এত প্রভোক্যাটিভ রচনা আমি বাংলা ভাষায় আর পড়ি নাই।

স্যারের মন্তব্য থেকে আমার রচনাটি তাঁর ভালো লেগেছে কি মন্দ লেগেছে কিছুই বুঝতে পারিনি। তখন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখাটি আমার পড়া ছিল না। অতি সম্প্রতিকালে লেখাটি পড়েছি। এইরকম সাম্প্রদায়িক রচনা শরৎবাবুও লিখতে পারেন আমার বিশ্বাস করতে অত্যন্ত কষ্ট হয়েছে। আমার লেখাটিকে কী অর্থে শরৎচন্দ্রের রচনার মতো প্রভোক্যাটিভ বলেছেন, অদ্যাবধি জানার চেষ্টা করিনি।

আট

একদিন আমি উত্তেজিত হয়েই স্যারের কাছে গেলাম। সেদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছিলো। স্যার বাড়িতেই ছিলেন। সারা শরীর চাদরে ঢেকে পত্রিকায় চোখ বুলোচ্ছিলেন। আমি বসবার আগেই বলে ফেললাম, কাল টিচার্স ক্লাবে শুনেছি, আপনি ইসলামিক একাডেমীতে নাকি একসময়ে কেনো আমি পাকিস্তান চেয়েছিলাম এ বিষয়ের ওপর একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

রাজ্জাক স্যারের চোখেমুখে কৌতুকবোধ ঝিলিক দিয়ে উঠলো : বক্তৃতা একটা দিছিলাম, ত আপনে চটছেন ক্যান্?

আপনি পাকিস্তানের পক্ষে ওকালতি করবেন চটবো না তো কী?

আমি ত পাকিস্তান চাইছিলাম, হেই কথাডা বলতে দোষ কী? তিনি আমার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালেন। তিনি যখন আহত বোধ করেন, তাঁর চোখ থেকে এ ধরনের দৃষ্টি বিচ্ছুরিত হয়। আমি একটুখানি ভয় পেয়ে গেলাম। আমার খেয়ালই ছিলো না আমার জন্মের বহু পূর্বে ঘটে–যাওয়া একটি ঐতিহাসিক ঘটনার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করার জন্য আমি স্যারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেছি। স্যার বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। আমিও সাহস করে কোনো কথা বলতে পারছিলাম না। এই নীরবতা আমার কাছে একটা দুর্বহ বোঝা হয়ে উঠেছে। ইচ্ছা হচ্ছিলো পালিয়ে চলে আসি। কিন্তু সেটাও সম্ভব হচ্ছে না।

এরই মধ্যে কাজের ছেলেটি তামাক দিয়ে গেলো। হুঁকোতে দুতিন টান দেয়ার পর স্যার মুখ খুললেন। মনে হল বেঁচে গেছি। স্যার বললেন, ওই বক্তৃতায় আমি কী কইছিলাম হেইডা আপনে দেখছেন কি না?

আমি বললাম, না।

স্যার বলতে শুরু করলেন, আমি কইছিলাম আপনেরা বাংলায় যত উপন্যাস লেখা অইচে সব এক জায়গায় আনেন। হিন্দু লেখক মুসলমান লেখক ফারাক কইরেন না। তারপর সব উপন্যাসে যত চরিত্র স্থান পাইছে রাম শ্যাম, যদু মধু, করিম রহিম নামগুলা খুঁইজ্যা বাইর করেন। তখন নিজের চৌকেই দেখতে পাইবেন, উপন্যাসে যেসব মুসলমান নাম স্থান পাইছে তার সংখ্যা পাঁচ পার্সেন্টের বেশি অইব না। অথচ বেঙ্গলে মুসলিম জনসংখ্যার পরিমাণ অর্ধেকের বেশি। এই কারণেই আমি পাকিস্তান দাবির প্রতি সমর্থন জানাইছিলাম।

আমার তর্ক করার ইচ্ছাটি তখনও দমে যায়নি। তাই জিগ্গেস করলাম, উপন্যাসে মুসলমান চরিত্রের উপস্থিতির স্বল্পতার কারণে আপনি কিন্তু একটি ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সমর্থন দিতে পারেন না।

আপনে এখন ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কথা কইতাছেন তখন সিচুয়েশন আছিল একেরে অন্যরকম। আরেকটা জিনিস মনে রাখবেন, উপন্যাস অইল গিয়া আধুনিক সোশিয়াল ডিসকোর্স। বেঙ্গলে হিন্দু মুসলমান শত শত বছর ধইর‍্যা পাশাপাশি বাস কইর‍্যা আইতাছে। হিন্দু লেখকেরা উপন্যাস লেখার সময় ডেলিবারেটলি মুসলমান সমাজরে ইগনোর কইরা গেছে। দুয়েকজন ব্যতিক্রম থাকলেও থাকবার পারে। বড় বড় সব হিন্দু লেখকের কথা চিন্তা কইর‍্যা দেখেন। তারা বাংলার বায়ু, বাংলার জল এই সব কথা ভালা কইর‍্যাই কইয়া গেছে। কিন্তু মুসলমান সমাজের রাইটফুল রিপ্রেজেনটেশনের কথা যখন উঠছে সকলে একেরে চুপ। মুসলমানসমাজরে সংস্কৃতির অধিকার থেইক্যা বঞ্চিত করার এই যে একটা স্টাবর্ন অ্যাটিটিউড হেই সময়ে তার রেমেডির অন্য কোনো পন্থা আছিল না।

একসঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলার পর স্যার একটু দম নিলেন। কাজের ছেলেটি চা দিয়ে গেলো। চায়ে চুমুক দেয়ার পর স্যার আবার মুখ খুললেন : আরেক হিসাব অবসর সময়ে কইর‍্যা দেইখ্যেন। নাইনটিন ফরটি সেভেন থেইক্যা সেভেনটি পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আমাগো এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেইক্যা লেখালেখির ক্ষেত্রে যতগুলান মানুষ বাইর অইয়া আইছে, নাইনটিন টুয়েনটি ওয়ান থেইক্যা শুরু কইর‍্যা ফরটি সেভেন, এই কোয়ার্টার সেঞ্চুরি হিসাব কইর‍্যা দেখেন মুসলমান সমাজের মধ্যে থেইক্যা সেইরকম একজনও মুসলমান লেখক বাইর অইছেন কি না। ফরটি সেভেনের পরে যেসব মুসলমান লেখক বাইর অইছে আউটলুকের দিক দিয়া সকলে আউট অ্যান্ড আউট সেক্যুলার। পাশাপাশি পশ্চিমবাংলার আধুনিক লেখকদের মধ্যে দেখবেন, সেক্যুলার লেখক অধিক পাইবেন না। হ তবে কথা উঠতে পারে আর্টিস্টিক একস্প্রেশন সম্পর্কে।

আমি বললাম, হিন্দুসমাজে সেক্যুলার চিন্তা-ভাবনা তো অনেকদিন আগেই শুরু হয়েছে।

স্যার বললেন, কথাটা ঠিক আবার ঠিকও না। যেই জিনিসটারে আপনেরা বেঙ্গল রেনেসাঁ কইবার লাগছেন, হেইডা মানতে আমার ঘোরতর আপত্তি আছে। আপনেরা রামমোহনরে রেনেসাঁর মানুষ কইবেন। কিন্তু হে কামডা কী করছে। তাঁর মতো এমন ধর্মপ্রচার আগেও ইন্ডিয়ায় অনেক মানুষ কইর‍্যা গেছেন। আমি ত তাঁর বাংলা ভাষা চর্চা ছাড়া উল্লেখ করবার মতো আর কোনো কিছু খুঁইজ্যা পাই না। এন্টায়ার নাইন্টিনথ সেঞ্চুরিতে পুরুষ সিংহ ওই একজনই পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর মশায় ছাড়া দেবেন ঠাকুর বলেন, বঙ্কিম বলেন, কেশব বলেন, সকলে ত নতুন কইর‍্যা রিভাইভিলিজমের বিকাশ

ঘটাইছেন। পার্থ চট্টোপাধ্যায় একটা মূল্যবান বই লিখছিলেন। নামটা জানি কী। তিনি দেখাইছেন, যে সময়ে বঙ্কিমের উপন্যাসগুলা প্রকাশ পাইবার লাগছিল, একই সময়ে বটতলার মুসলমানি পুঁথিগুলাও মুদ্রণযন্ত্রে ছাপা অইয়া বাইর অইতে আছিল। বঙ্কিমের উপন্যাস দুইশ আড়াইশর বেশি ছাপা অইত না। কারণ আধুনিক সাহিত্য পড়ার পাঠক আছিল খুব সীমিত। কিন্তু বইটা পড়লে দেখতে পাইবেন মুসলমানি পুঁথি ছাপা অইতাছিল হাজারে হাজারে। বঙ্কিমের বিষয়বস্তুর সঙ্গে পুঁথির বিষয়বস্তুর তুলনা করলে ডিফারেন্সটা সহজে বুঝতে পারবেন। পুঁথির বিষয়বস্তু একেরে সেক্যুলার, কিন্তু চিন্তাপদ্ধতি মধ্যযুগীয়। বঙ্কিমের চিন্তা আধুনিক কিন্তু বিষয়বস্তু ধর্মীয়।

আমি প্রতিবাদ করে বললাম, বঙ্কিমের সব রচনার বিষয়বস্তু তো ধর্মীয় নয়।

স্যার বললেন, ওই অইল একই কথা, রিভাইভিলিস্ট স্পিরিট অ্যান্ড মডার্ন স্পিরিট এ ওর গায়ে ঠেস দিয়া খাড়াইয়া আছে।

স্যারের কথাটা পুরোপুরি মেনে নিতে আমার কষ্ট হচ্ছিলো। তাই বললাম, মাইকেল, বঙ্কিম ওনাদের হাতেই তো বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার সূত্রপাত।

স্যার বললেন, আধুনিকতা জিনিসটিরেও ত ভালা কইর‍্যা বুঝন লাগব। আধুনিকতা জিনিসটি বেবাক দুনিয়ায় একই সময়ে আইছে। দশ বছর আগে কিংবা দশ বছর পরে। বিলাতে রেলগাড়ি চালু অওনের দশ বছর পরে ইন্ডিয়াতে রেল আইয়া গেছে। বঙ্কিম মারা গেছেন আঠারশো তিরানব্বই সালে। আর টলস্টয় মারা গেলেন উনিশশো এগারো সালে। বঙ্কিমের তুলনায় টলস্টয় দীর্ঘ জীবন পাইছিলেন। সেই দিক দিয়া দেখতে গেলে টলস্টয় বঙ্কিমের কন্টেম্পরারি। দুইজনের লেখার কন্টেন্ট মিলাইয়া দেখেন। টলস্টয় কমন ম্যানকে কী চৌকে দেখছেন, আর বঙ্কিম কী চৌকে দেখছেন। শুধু টলস্টয় আর বঙ্কিম কেন ইউরোপের লিটারারি স্টলওয়ার্ট ফ্লবেয়ার, মোপাসাঁ, চেখভ, টুর্গেনিয়েভ, গোগল, জোলা সকলে একটা বিশেষ সময়ের মানুষ। এদের লগে আপনে রবীন্দ্রনাথরেও ধরবার পারেন।

আমি বললাম, স্যার, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু বলেন।

স্যার বললেন, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ঠিকই আছিল। বাংলা ভাষাটি ত রবীন্দ্রনাথের হাতেই পুষ্ট অইছে। এক হাতে বিচিত্র বিষয় নিয়া লিখছেন, এইটাই রবীন্দ্রনাথের সবচাইতে বড় ক্রেডিট। আদার দ্যান লিটারারি ট্যালেন্ট অন্যান্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের যদি বিদ্যাসাগরের মতো মানুষদের সঙ্গে তুলনা করেন, হি কামস নো হোয়ার নিয়ারার টু দেম।

স্যারের কথাটা শুনে আমার ভালো লাগল না। আমি রবীন্দ্রনাথকে খুব বড় একজন মানুষ হিসেবে ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। তাই জিগ্গেস করলাম, রবীন্দ্রনাথ কি খুব বড় একজন মানুষ নন?

স্যার বললেন, রবীন্দ্রনাথ বড় লেখক, মানুষ হিসাবে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর কিংবা তাঁর মতো মানুষদের ধারেকাছেও আসতে পারেন না। বড় লেখক এবং বড় মানুষ এক নয়। বড় লেখকদের মধ্যে বড় মানুষের ছায়া থাকে। বড় মানুষরা আসলেই বড় মানুষ। লেখক কবিরা যা বলে সেরকম আচরণ না করলেও চলে। হের লাইগ্যা প্লেটো তার রিপাবলিক থ্যাইক্যা কবিগো নির্বাসনে পাঠাইবার কথা বলছিল।

আমি বললাম, একথা কি রবীন্দ্রনাথের বেলায়ও প্রযোজ্য।

স্যার বললেন, রবীন্দ্রনাথ ব্যতিক্রম অইল কেমনে। তিনিও ত এই ক্যাটাগরির মধ্যে পড়েন।

আমার মনের মধ্যে একটুখানি খুঁতখুঁতানি থেকে গেল। সেজন্য পালটা প্রশ্ন করলাম, রবীন্দ্রনাথ কি বাঙালি জনগোষ্ঠীর ভাষাকে উৎকর্ষের একটা বিশেষ স্তরে নিয়ে যাননি?

স্যার বললেন, বাংলা ভাষাটা বাঁচাইয়া রাখছে চাষাভুষা, মুটেমজুর—এরা কথা কয় দেইখ্যাই ত কবি কবিতা লিখতে পারে। সংস্কৃত কিংবা ল্যাটিন ভাষায় কেউ কথা কয় না, হের লাইগ্যা অখন সংস্কৃত কিংবা ল্যাটিন ভাষায় সাহিত্য লেখা অয় না।

স্যার তারপর রবীন্দ্রনাথের সামাজিক প্রবন্ধ নিয়ে তাঁর মতামত প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন। তিনি বলতে থাকলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সামাজিক প্রবন্ধসমূহে যে সকল এমপিরিক্যাল কথাবার্তা কইছেন, সেগুলা খুব কাজের জিনিস অইছে। এ নিয়া বেশি মানুষরে কথাবার্তা কইতে দেখা যায় না। আমার ইচ্ছা আছিল যে সকল সামাজিক প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে স্থান পাইছে, সেগুলোর একটা তালিকা করা।

কিছুদিন পরেই দেখতে পেলাম রাজ্জাক স্যার রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধসমূহ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছেন, বিশেষ বিশেষ জায়গায় লাল পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করছেন। ছোটো ছোটো কাগজের টুকরো দিয়ে চিহ্নিত পৃষ্ঠাসমূহে নিশানা দিয়ে রাখছেন। আরও কিছুদিন পরে গিয়ে দেখলাম রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের বই স্যারের টেবিল থেকে উধাও। বুঝতে বাকি রইলো না স্যারের মহৎ সঙ্কল্পগুলোর এভাবেই ইতি ঘটে থাকে। প্রথম দিকে রাজ্জাক স্যারের রবীন্দ্রনাথের গানের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল না। শেষের দিকে দেখলাম তিনি রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো গানের তারিফ করেছেন। বিশেষ করে ধ্রুপদাঙ্গের গানগুলো।

নয়

এই রচনায় চিত্রশিল্পী এস এম সুলতানের সঙ্গে রাজ্জাক স্যারের সম্পর্কের বিষয়টি আমি বিবৃত করতে চাই। আমার সঙ্গে আকস্মিকভাবে সুলতানের পরিচয় হয়। কী করে কোন পরিস্থিতিতে সুলতানের সঙ্গে আমার পরিচয় হল, সে বিষয়ে এখানে বিশেষ বলার অবকাশ নেই। শুধু এটুকু বলতে চাই, উনিশশো ছিয়াত্তর সালে শিল্পকলা একাডেমীতে সুলতানের আঁকা প্রায় পাঁচশো ছবির একটা প্রদর্শনী হয়। এই প্রদর্শনীতেই প্রথম আমি সুলতানের আঁকা ছবি দেখি এবং অভিভূত হয়ে যাই। পত্রপত্রিকায় সুলতানের বেশভুষা, বৈচিত্র্যময় জীবন, এবং গঞ্জিকাপ্রীতি এসব নিয়ে এন্তার গল্প কাহিনী প্রচারিত হলেও চিত্রশিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিরা সুলতানের আঁকা ছবির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সম্বন্ধে কোনো কথা বলতে কেউ রাজি ছিলেন না। নানা মানুষের সঙ্গে কথা বলে একটা ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হয় যে ইংরেজিতে যাকে কনস্পিরেসি অভ সাইলেন্স বলা হয়, সুলতানকে ঘিরেও একটা নীরব ষড়যন্ত্র আর্ট এস্টাবলিশমেন্টের লোকেরা করে যাচ্ছিলেন। নীরব উপেক্ষার মাধ্যমে সুলতানের শিল্পকর্মকে সর্বসাধারণের সচেতন মনোযোগ থেকে আড়াল করে রাখাই ছিল এঁদের অভিপ্রায়।

আমি যখন বুঝতে পারলাম, শহরবাসী আর্ট এস্টাবলিশমেন্টের লোকেরা সুলতানের শিল্পকর্মের ব্যাপক পরিচিতি এবং মূল্যায়নের পথে একটা অদৃশ্য প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে, তারপর আমি আমার কর্তব্য স্থির করলাম। যে-করেই হোক, সুলতানকে অবশ্যই জনসমক্ষে প্রকাশমান করে তুলতে হবে। কিন্তু মুশকিল হল আমি নিজে কিন্তু চিত্রশিল্পী নই। চিত্রশিল্পের ব্যাপারে আমার মতামতের কোনো মূল্য নেই। তাই আমি চাইছিলাম, সমাজে মান্যতা অর্জন করেছেন এমন কোনো ব্যক্তি যদি সুলতানকে তুলে ধরতে এগিয়ে আসেন আমার কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায়। অনেকের কাছেই গেলাম। কেউ-কেউ আগ্রহ প্রদর্শন করলেন, কেউ-কেউ শীতলতা। যাহোক রাজ্জাক স্যারের কাছে গিয়ে সুলতানের ছবি সম্পর্কে অনেক ভালো ভালো কথা বললাম। দেখলাম, চিড়ে ভেজার কোনো সম্ভাবনা নেই। স্যার তখনও শিল্পী বলতে বোঝেন, ওই একমাত্র জয়নুল আবেদীন। চিত্রকলার অনেক লোকের সঙ্গে স্যারের ওঠা বসা, যাওয়া-আসা আছে, কিন্তু প্রাণের ভেতর থেকে জয়নুল আবেদীন ছাড়া অন্য কাউকে স্বীকৃতি দিতে চান না।

আমি একটুখানি দমে গেলাম। এই এতদিনে রাজ্জাক স্যারকে অত্যন্ত সংবেদনশীল চরিত্রের মানুষ বলে জেনে গিয়েছিলাম। তাঁর কাছ থেকে কোনো

ইতিবাচক সাড়া যখন পাওয়া গেল না সুলতানকে নিয়ে কী করবো স্থির করতে পারছিলাম না। কিন্তু আমার স্থির ধারণা সুলতান একজন বিশ্বমাপের শিল্পী। সকলে তাঁকে স্বীকার করে নিতে কুণ্ঠা প্রদর্শন করছেন। কারণ তাঁরা একজন আগন্তুককে শ্রেষ্ঠত্বের আসনখানি ছেড়ে দিতে নারাজ। আমি মনেমনে এভাবে গোটা ব্যাপারটা চিন্তা করলাম। সুলতানের মতো আমিও গ্রাম থেকে এসেছি। আজকে শহরের লোকেরা সুলতানকে যে উপেক্ষা এবং অবহেলা প্রদর্শন করছে, এই জিনিসটি একদিন আমার বেলায়ও ঘটতে পারে। সুলতানকে যদি ওই নীরব ষড়যন্ত্রের জাল থেকে বের করে না আনতে পারি, একদিন আমাকেও সুলতানের ভাগ্য মেনে নিতে হবে। আর্ট ইনস্টিটিউটের শিক্ষিকা শামীম শিকদার আমার বন্ধু ছিল। সে ছিল তখন ছাত্রী। শামীম এবং তার বন্ধুবান্ধবেরা আমার ইন্টারন্যাশনাল হোস্টেলের কক্ষটিকে অনেকটা তাদের স্টুডিও হিসেবে ব্যবহার করতো। এই ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মেলামেশা করতে গিয়ে আমি নিজেও অল্পস্বল্প ছবি আঁকার কলাকৌশল রপ্ত করলাম। খুব গভীরভাবে শিল্পকলা সম্বন্ধে পড়াশোনা করতে আরম্ভ করলাম। অনেকদিন পড়াশোনা করার পর আমার একটা প্রত্যয় জন্মালো যে সুলতানের সম্পর্কে কিছু সাহসী বক্তব্য প্রকাশ করার যোগ্যতা আমার জন্মেছে। আমি সুলতানের চিত্রকর্মের ওপর 'বাংলার চিত্রঐতিহ্য এবং সুলতানের সাধনা' শিরোনামে পঞ্চাশ পৃষ্ঠার একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে 'মূলভূমি' নামাঙ্কিত একটি সাময়িকীতে প্রকাশ করলাম। তারপর প্রবন্ধটা আলাদা একটি পুস্তিকা হিসেবে প্রকাশ করি এবং সাহিত্যশিল্পের অনুরাগী মানুষদের একটি করে পুস্তিকা কখনো নিজের হাতে অথবা লোক মারফত কিংবা ডাকযোগে পাঠিয়ে দিতে থাকি। একটা পুস্তিকা নিয়ে একদিন রাজ্জাক স্যারের বাড়িতে হাজির হলাম। স্যারকে বিশেষভাবে অনুরোধ করি তিনি যেনো আমার লেখাটি পড়ে দেখেন। স্যার যেনো মনে না করেন আমি একটা উটকো লোকের বিষয় নিয়ে অযথা উৎপাত করছি, সেজন্য দশ পনরোদিন ওমুখো হইনি।

এক সকালবেলা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শুনলাম কে একজন দরোজায় টোকা দিচ্ছে। চোখেমুখে ঘুম নিয়েই আমি জিগ্‌গেস করলাম, কে? জবাব পেলাম, আমি আবদুর রাজ্জাক।

বজলুর ক্যান্টিনের যে ছেলেটা সকালে নাস্তা খাওয়ার জন্য ঘুম থেকে জাগিয়ে দিতো তার নামও আবদুর রাজ্জাক। আমি ভাবলাম ক্যান্টিন-বয় আবদুর রাজ্জাক আমাকে নাস্তা খাওয়ার জন্য ডাকতে এসেছে। আমি ঘুমের ঘোরেই বলে বসলাম, রাজ্জাক মিয়া এখন যাও, পরে গিয়ে নাস্তা খাবো।

ওপার থেকে জবাব পাওয়া গেল, পরে আইলে নাস্তা নাও পাইতে পারেন।

রাজ্জাকের বাড়ি বরিশাল। এই আওয়াজটি বরিশালের নয়। আমি উঠে দরোজা খুললাম। ওমা, দেখি রাজ্জাক স্যার! স্যার ঘরে এসে বসলেন। তার হাতে পুস্তিকাটি। আমাকে বললেন, কামডা ভালা করছেন। আপনের সুলতান কই?

আমি বললাম, তিনি নড়াইলে থাকেন।

স্যার বললেন, ঢাকায় আইব না?

বললাম, দু চার দিনের মধ্যে আসার কথা আছে।

স্যার বললেন, আইলে একবার দেখা করাইয়া দিয়েন।

সুলতানের প্রসঙ্গ শেষ করার আগে আরও দুটি মজার গল্প আমাকে বলতে হবে। আমি একটা প্রেস করেছিলাম। সেই প্রেস থেকে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করতাম। বত্রিশ নম্বর তোপখানা রোডে ছিল অফিস। তখন আমি মীরপুরে থাকতাম। একদিন স্যারকে বাড়িতে যেয়ে অনুরোধ করেছিলাম, তিনি যেনো আমার প্রেসে এসে একবার পায়ের ধুলো দিয়ে যান। পরের দিন অফিসে এসেই আমার প্রেসের ম্যানেজারের মুখে শুনলাম, একজন লুঙ্গি, চাদর এবং পাঞ্জাবি–পরা বুড়োমতো মানুষ বেলা ন'টার সময় এসে অনেকক্ষণ আমার নাম ধরে ডাকাডাকি করেছেন। স্যার যে পরদিনই প্রেসে চলে আসবেন ভাবতে পারিনি। আমি ম্যানেজারকে জিগ্গেস করলাম, আপনি অফিস খুলে বসতে দেননি কেনো? ম্যানেজার আমাকে জানালেন, আমি মনে করেছি প্রেসের মেশিনম্যান কিংবা কম্পোজিটরের চাকুরি চাইতে লোকটা এসেছিলো। আমাদের কোনো মানুষের প্রয়োজন নেই। তাই বলে দিয়েছি আমাদের এখানে কোনো মানুষের দরকার নেই। শুনেই লোকটা চলে গেলো।

আমি ভীষণ শরমিন্দা হয়ে পড়লাম। দুপুরবেলাতেই স্যারের বাড়িতে গেলাম। বাড়িতে সকলে তখন খেতে বসছেন। স্যার আমাকে দেখেই বললেন, এ্যাতো দেরি কইর‍্যা আইলে আপনের ব্যবসা চলব কেমন কইর‍্যা। আমি আমার কর্মচারীর খারাপ ব্যবহারের জন্য মাফ চাইতে যাচ্ছিলাম। স্যার আমাকে মুখই খুলতে দিলেন না। বললেন, হাত ধুইয়া বইয়া পড়েন, অনেকদিন আপনে আমাগো লগে খাইতে আহেন না।

আরেকবার আমার এক জার্মান–প্রবাসিনী পশ্চিমবাংলার বান্ধবী এসেছিল। তাকে নিয়ে গুলশানে স্যারের সঙ্গে দেখা করতে যাই। তিনি তখন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আবুল খায়ের লিটুর সঙ্গে থাকতেন। সেদিন দুপুরে আমরা স্যারের ওখানে খাওয়াদাওয়া করেছিলাম। তখন চৈত্রমাস শেষ হতে চলেছে। আমরা খেয়েদেয়ে বাড়ির সামনের উঠানে এসে দাঁড়িয়েছি, আমার বান্ধবীটি গাছে

থরেথরে ঝুলন্ত কাঁঠাল দেখে ভীষণরকম উদ্বেল হয়ে ওঠে। সে স্যারকে জিগ্‌গেস করে বসে, কাকাবাবু, আপনার বাড়ির কাঁঠাল দিয়ে এঁচোড় রান্না করা যায় না?

স্যার বললেন, আপনের এঁচোড় খাইবার খুব ইচ্ছা হয় নিহি?

আমার বান্ধবীটি বলল, সেই কবে ছোটোবেলায় খেয়েছি। আপনার গাছের কাঁঠাল দেখে এঁচোড়ের কথা মনে পড়ে গেল।

স্যার বললেন, এঁচোড় যে খাইবার চান কী করে রানতে অয় হেইডা জানেন কি না।

আমার বান্ধবী মুখ কালো করে বললেন, না কাকাবাবু, এঁচোড় কী করে রাঁধতে হয় শিখিনি।

স্যার আমাকে বললেন, মৌলবি আহমদ ছফা এক কাম করেন, আপনি কই থাকেন ঠিকানা লেইখ্যা থুইয়া যান। কাইল দুপুরে এঁচোড় রাইন্ধ্যা পাঠাইয়া দিমুনি।

আমি ঠিকানা লিখে চলে এলাম।

পরের দিন আমার বান্ধবীকে কাচপুর ব্রিজের কাছে নদী দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে ফিরতে ফিরতে বেলা হয়ে গেল। ঘরে এসে যখন গোসল করে বসলাম, আমার কাজের ছেলে ইদ্রিসের কাছে কাহিনীটা শোনা গেল।

ইদ্রিস বলল, একটা বুইর‍্যা মানুষ এই টিফিন ক্যারিয়ারটা রাইখ্যা গেছে। তখনই মনে পড়ে গেল। রাজ্জাক স্যার বলেছিলেন তিনি এঁচোড় রান্না করে দুপুরবেলা পাঠিয়ে দেবেন। আমি ইদ্রিসকে জিগ্‌গেস করলাম, তুমি ভদ্রলোককে খাতির করে ঘরে ডেকে বসিয়েছিলে কি না।

ইদ্রিস জবাব দিল, মানুষটার গায়ে একটা ফাড়া ছিঁড়া পাঞ্জাবি আর ময়লা লুঙ্গি আর ঢাকাইয়া কথা কয়। কইথেক্যা আইছে যখন জিগাইলাম, কয় সায়েব টিফিন ক্যারিয়ার দেখলেই বুঝতে পারবো নে। আমিও ডাকি নাই। হেই বেডাও বসবার চায় নাই।

এখন সুলতানের কথায় আসি। মাসখানেক পড়ে সুলতান এলেন নড়াইল থেকে। আমি ওনাকে নিয়ে স্যারের বাড়িতে গেলাম। সুলতানের একটা বৈশিষ্ট্য আমি গোড়া থেকেই লক্ষ করে এসেছি। যাঁদের সঙ্গেই তার পরিচয় হয়, সকলে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। স্যারের বেলায়ও তার ব্যত্যয় হল না। স্যার একা নন, তাঁর পরিবারের সকলেই সুলতানের প্রতি মমতাসম্পন্ন হয়ে উঠেছেন। স্যারের ভ্রাতৃবধূ, দুই ভ্রাতুষ্পুত্রী মায় অতিশিশু নাতিটি পর্যন্ত সুলতানের অনুরাগী

হয়ে উঠেছে। এত মিষ্টি করে এমন সুন্দর কথা সুলতানের মতো আর কাউকে বলতে দেখিনি।

সেদিনই বিকেলবেলা সুলতান তাঁর জোব্বাজাব্বা, নিজের হাতে বানানো বাঁশির বোঝা, গাঁজার কল্কি এবং অন্যবিধ সাজসরঞ্জাম নিয়ে স্যারের বাড়ির নিচতলায় এসে আস্তানা পাতলেন। তার পর থেকে যখনই স্যারের বাড়িতে যাই দেখি আমার সঙ্গে সুলতানের কথা বলার সময় হয় না। কখনো দেখি স্যারের মুখোমুখি বসে গম্ভীরভাবে আলাপ করছেন এবং মাথা দোলাচ্ছেন। অথবা বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে প্রবাসজীবনের গল্প করছেন। স্যারের শ্যামলা নাতি লিটুর ছেলে যার চোখদুটি খুব বড় বড় এবং যে বড়সড়ো খাঁচায় দুটো রাজঘুঘুর বাচ্চা পোষে, তার সঙ্গেও দেখি সুলতানের গলায়-গলায় ভাব। প্রতিদিনই দেখি সুলতান স্যারকে নিয়ে নানা জায়গায় যাচ্ছেন। আমার খুব ঈর্ষা হচ্ছিলো। আমিই সুলতানকে স্যারের কাছে নিয়ে এলাম, এখন দেখতে পাচ্ছি সুলতান আমাকে হটিয়ে দিয়েছেন।

একদিন সকালবেলা স্যারের বাড়িতে গিয়ে দেখি সুলতান নেই। আমি স্যারকে জিগ্‌গেস করলাম, সুলতান ভাই কই?

স্যার বললেন, সুলতানের লোকরা আইস্যা ডাইক্যা লইয়া গেছে।

আমি বললাম, সুলতানের আবার লোকজন আসবে কোথেকে!

স্যার বললেন, তামুক টামুক খাইবার লোকজন আর কি।

আমি বললাম, গাঁজাখোররা আপনার বাড়ির ঠিকানা পেল কেমন করে?

স্যার হাসতে হাসতে বললেন, ঠিকানা পাওনের কোনো কষ্ট নাই, অরা গায়ের গন্ধেই টের পাইয়া যায়।

তারপর স্যার আসল কথা পাড়লেন। কয়েকদিন থেকে সুলতান নাকি স্যারকে বলছেন তাঁর তিনশোর মতো ছবি সোনার গাঁয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এগুলো যদি ওখান থেকে উদ্ধার করা না যায় ছবিগুলোর কিছুই থাকবে না। সুলতানের ছবি সোনার গাঁয়ে গেল কী করে সে কাহিনীটা বলা প্রয়োজন। উনিশশো ছিয়াত্তর সালে শিল্পকলা একাডেমীতে যখন সুলতানের চিত্রকর্মের প্রদর্শনী হয়, সেই সময়ে প্রভাবশালী মন্ত্রী নূরুল ইসলাম শিশুর বেগম প্রদর্শনীতে ছবি দেখে সুলতানের ছবির প্রতি অনুরাগী হয়ে ওঠেন। ভদ্রমহিলার বোধহয় অল্পস্বল্প আঁকার ঝোঁক ছিলো। তিনি সুলতানকে ছবি আঁকা শিখিয়ে দিতে অনুরোধ জানান। সুলতানও রাজি হয়ে যান। কিছুদিন মন্ত্রীর বাড়িতে সুলতানের নিয়মিত যাওয়া-আসা চলে। সেই সূত্রে নূরুল ইসলাম শিশুর সঙ্গে সুলতানের পরিচয়। একদিন কথায়-কথায় সুলতান মন্ত্রীসাহেবকে জানান, এই

প্রদর্শনীর শেষে ছবিগুলো নিয়ে কোথায় রাখবেন ও নিয়ে তাঁর ভয়ানক দুশ্চিন্তা। ঢাকা কিংবা কাছাকাছি কোথাও একটু জায়গা পাওয়া গেলে সুলতান ছবিগুলো সরিয়ে নিয়ে রাখতে পারেন। নুরুল ইসলাম শিশু সাহেব সরকারি ক্ষমতা খাটিয়ে সোনার গাঁয়ের পানামে একটা পরিত্যক্ত দোতলা বাড়ি সুলতানকে বরাদ্দ করেন। সুলতান শিল্পকলা একাডেমী থেকে ছবিগুলো সে বাড়িতে নিয়ে যান এবং তাঁর বিশ্বস্ত চেলা বাটুলকে নিয়ে সে বাড়িতে বাস করতে আরম্ভ করেন। এই জায়গাটি সুলতানের মনে ধরেছিলো, তার পেছনে বোধকরি একটাই কারণ—এই বাড়ির পাঁচ সাত বাড়ি পরে জয়নুল আবেদীন লোকশিল্প জাদুঘর স্থাপন করেছিলেন। হয়তো সুলতানও ওরকম কিছু একটা স্বপ্ন দেখেছিলেন।

মাসখানেক থাকার পর অনুভব করলেন, এই দরোজা-জানালাহীন পিশাচের মতো দাঁত-বের-করা লাল ইটের জীর্ণ বাড়িতে সুলতানের পক্ষে বাস করা সম্ভব নয়। তিনি বাটুলকে এই বাড়িতে রেখে নড়াইল চলে গেলেন। ছবিগুলো বৃষ্টিতে ভিজতে থাকে, রোদে পুড়তে থাকে। কিছুদিন বাটুল এবং তার মাকে খাওয়া-পরার পয়সা জুগিয়েছিলেন। বাটুল আদি পেশায় ছিল নরসুন্দর। সুলতানের আকর্ষণে জাতপেশা ছেড়েছিল এবং বাটুলের জননী ছিল সুলতানের শিষ্যাদের একজন। অনেকেই হয়তো জানেন না সুলতান ছিলেন নড়াইলে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের কাছে একজন দেবতার মতো মানুষ। তারা গোঁসাইজ্ঞানেই তাঁকে শ্রদ্ধা করতো। তাঁর শিষ্য-শিষ্যার সংখ্যাও ছিল অনেক।

সুলতান বাটুলকে সোনার গাঁয়ের বাড়িতে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়ে সেই যে চলে এসেছিলেন সেই বাড়িতে আরেকবার মাত্র পদার্পণ করেছিলেন। জীবনধারণের জন্য বাটুল সে বাড়ির কাছাকাছি একটা সেলুন খুলে বসে। নড়াইল থেকে মা, বউ এবং বাচ্চাদের নিয়ে ওই বাড়িতে বাস করতে আরম্ভ করে। কিছুদিন পর বাটুলের মা ওই বাড়িতে মারা যায়। আমিনুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি বাটুলকে সপরিবারে জোর করে তাড়িয়ে দিয়ে বাড়ি দখল করে বসে এবং এটা ব্যক্তিগত সম্পত্তি লিখে একটা সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দেয়।

বাটুল অন্য একটা বাসা ভাড়া করে বাস করতে আরম্ভ করে। সে সময়ে আশা পোষণ করতো একসময়ে সুলতান সেই বাড়িতে গিয়ে বসবাস করবেন। উনিশশো চুরানব্বই সালে সুলতান মারা যাওয়ার পর বাটুল বিশ্বাস করতো এই বাড়িতে সুলতানের কোনো স্মৃতি থাকলো না। বাটুল প্রায়ই আমার কাছে আসতো এবং বলতো সুলতানের মতো একজন মহাপুরুষের স্মৃতি কিছুতেই মুছে যেতে পারে না। সোনার গাঁয়ের সুলতানের স্মৃতিরক্ষার জন্য কিছু একটা ব্যবস্থা

হবেই। বাটুলের এই বিশ্বাস আমার কাছে পাগলামো মনে হত। তবু তাকে সে কথা বলতে পারিনি। উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে স্থানীয় কিছু তরুণদের নিয়ে সুলতানের মৃত্যুদিবস ওই বাড়ির সামনে উদ্‌যাপন করার আয়োজন করেছিল। আমার কাছে পাকা কথা আদায় করেছিল। ঠিক দুটোর সময়ে পানামের বাড়িটির সামনে গিয়ে হাজির হই। আমি রত্নেশ্বর নামক তরুণ এবং বন্যা নামের এক তরুণীকে নিয়ে ঠিকই সোনারগাঁয়ে গিয়েছিলাম। ওই বাড়িটির সামনে গিয়ে দেখি পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। বাটুলকে অনেক খোঁজ করে বের করতে হলো। বাটুল জানালো সে লজ্জিত। কিন্তু আমাদের সান্ত্বনা দিতে ভুললো না। স্যার, কিছু মনে করবেন না। ফাঁকিজুকি আর ক'দিন চলবে! কতদিন আর দেবতার জায়গা দখল করে রাখতে পারবে! দেখবেন এই বাড়িতেই শিল্পী সুলতানের শিল্পমন্দির তৈরি হবে। এই সোনার গাঁতেই একদিন শিল্পী সুলতানের নামের ডঙ্কা বাজবে।

এরই মধ্যে বাটুল আমার কাছে আরও পাঁচ–সাতবার আসা–যাওয়া করেছে। সে এলে অমি ভারি বিব্রত হয়ে পড়তাম। কোনোরকমে যাওয়া–আসার পথখরচটা দিয়ে রেহাই পেতে চেষ্টা করতাম। তথাপি বাটুলকে আমি শ্রদ্ধা করতাম। কারণ তার মধ্যে আমি একটা পবিত্র অগ্নিশিখা জ্বলছে, এরকম অনুভব করতাম। দুমাস আগে বাটুলের ন্যাড়ামাথা বড়ো ছেলেটি এসে জানিয়ে গেলো দশদিন আগে তার বাবা মারা গেছে। ছেলেটি জানালো মরবার আগেও তার বাবার মুখে ছিল সুলতান সাহেবের নাম। ছেলেটি দশ পনেরো দিন অন্তর একবার করে আসে। আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় তার একটি চাকুরির প্রয়োজন। এখনও পর্যন্ত আমি তার কিছুই করতে পারিনি। আর আসে প্রফুল্ল। প্রফুল্লের কথাটি বলে আমি আবার রাজ্জাক স্যারের কথায় ফিরে যাবো।

আগুন যেমন পতঙ্গকে আকর্ষণ করে সুলতানের প্রতিও কিছু মানুষ তেমনি আকৃষ্ট হত। প্রফুল্ল তার একজন। প্রফুল্লর বাড়ি কুমিল্লা জেলায়। পেশাতে সে কাঠমিস্ত্রি। বাড়িতে তার এক বুড়ো দাদা আর তার ছেলেমেয়ে। প্রফুল্লের বয়স চল্লিশ ছুঁইছুঁই। এখনও বিয়ে করেনি। একসময় ঠিকা কাজ করতে সোনার গাঁ এসেছিলো। তখনই সুলতানের সঙ্গে পরিচয়। তার পর থেকেই সে ছবি আঁকতে শুরু করে। গুরু সুলতান। তিনি ভরসা দিয়েছেন, এঁকে যাও, একসময় তুমি নামকরা শিল্পী হবে। গুরুর আশীর্বাদ সম্বল করেই প্রফুল্ল এঁকে যাচ্ছে। রঙ নেই, তুলি নেই, কিছু নেই, তথাপি প্রফুল্লের বিরাম নেই। দূর থেকে দেখলে প্রফুল্লের ছবিগুলোকে সুলতানের ছবি বলে ভ্রম হয়। কাছে এলে অবশ্য টের পাওয়া যায়। প্রফুল্লের যদি আরেকটু বিদ্যা থাকত, সে যদি আরেকটু সচ্ছল হত! সুলতানকে

কেনো আমি অসাধারণ একজন মানুষ মনে করতাম, এতদিনে তার একটা কারণ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি। সুলতান প্রফুল্লের মতো একজন মাঝ–বয়সী অশিক্ষিত মানুষের মনেও শিল্পী হওয়ার বীজ বুনে দিতে পেরেছিলেন। এমন তো আর কাউকে দেখিনি।

এ লেখা যখন লিখছি তার এক সপ্তাহ আগে প্রফুল্ল এসেছিল। জামার পকেট থেকে দুমড়ানো মোচড়ানো একটা পেপারকাটিং বের করে দিয়ে বলল, স্যার পড়ে দেখুন।

আমি বললাম, তুমিই পড়ে শোনাও।

সে পড়ে শোনালো। ভ্যান গগ–এর একটি ছবি নীলামে বিক্রি হয়েছে। আমাদের টাকায় দাম উঠেছে আটান্ন কোটি টাকা। প্রফুল্ল বলল, স্যার, আটান্ন কোটি অনেক টাকা—তার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো—অথচ লোকটা না খেতে পেয়ে আত্মহত্যা করেছে।

রাজ্জাক স্যারের কথা বলতে গিয়ে সুলতানের কথা বলতে হচ্ছে। সুলতানের কথায় বাটুল এবং প্রফুল্লের কথা ঢুকে পড়েছে। এগুলো অপ্রাসঙ্গিক। তবু বললাম। হয়তো সুলতানের ওপর আবার লেখার সুযোগ আমার হবে না।

যাহোক মূল বিষয়ে ফিরে আসি। রাজ্জাক স্যার বললেন, সুলতানের ছবিগুলা নিয়া আইবার কথা কইবার লাগছে তিন চার দিন থেইক্যা। হাঁচাই ত এইভাবে পইড়্যা থাকলে ছবির কিছু থাকত না। আমি হুদা সাহেবরে কইয়া একখানা ট্রাকের ব্যবস্থা করছি। কাইল আপনের হাতে যদি সময় থাকে একটু গেলে ভালা অয়। সুলতান সায়েব আপনভোলা মানুষ। কওন তো যায় না কখন কী কইর্যা বসে! সরকারি গাড়ি পাঁচটার আগে ইডেন বিল্ডিংসের গেরেজে দিয়া আইতে অইব। নইলে হুদা সাহেবকে বিব্রত বোধ করতে অইব।

হুদা সাহেবের একটু পরিচয় দেয়া প্রয়োজন। হুদা সাহেব মানে মির্জা নূরুল হুদা। একসময় তিনি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হয়েছিলেন। তারপরে জিয়ার সময়ে বাংলাদেশের মন্ত্রী হয়েছিলেন। তিনি রাজ্জাক সাহেবের ছাত্র এবং অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষকও ছিলেন।

আমি রাজি হয়ে গেলাম। বললাম, যাবো।

তার পরের দিন ট্রাক নিয়ে সোনার গাঁ চলে গেলাম। সুলতান সাহেবের নামে বরাদ্দ করা বাড়িটা দেখলাম। চূন বালি ঝরে গেলেও বাড়ির কাঠামোটা এখনও বেশ শক্ত। কিন্তু একটিও দরোজা–জানালা নেই। ড্রাইভার এবং আরেকজন লোকের সাহায্যে ছবিগুলো একে একে ট্রাকে তুলতে লাগলাম। সাধারণত সুলতান খুব বড় ক্যানভাসে ছবি আঁকতেন। উনিশশো ছিয়াত্তর

সালের একজিবিশনের জন্য সুলতান তিরিশ–পঁয়ত্রিশটা ছোটো ছোটো ছবি এঁকেছিলেন। একজিবিশনে এই ছোটো ছবিগুলোর দিকে ভালো করে তাকাতে পারিনি। এখন দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। একেকটি ছবিকে জীবনানন্দ দাশের রূপসী বাংলার একেকটি কবিতার সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছে হল।

সব ছবি ওঠানোর পর বাঁধাছাঁদা করে সব যখন ঠিক করে ফেলেছি, গোল বাধালেন সুলতান স্বয়ং। গেরুয়া পাঞ্জাবি পরা দাড়িঅলা একটা মানুষ একতারা–হাতে হাজির হলো। সুলতান দাঁড়িয়ে লোকটির সঙ্গে কোলাকুলি করলেন। তারপর দুজনে গাঁজা টানতে বসে গেলেন। গাঁজার কল্কিতে দম দিয়ে সুলতান মাথা দোলাচ্ছেন আর বুড়োটি শুরু করেছেন একতারা বাজিয়ে গান। সুলতানকে টেনেও ওঠানো যায় না। আমি পড়ে গেলাম মহামুশকিলে।

কাঁটায়–কাঁটায় পাঁচটার সময় ট্রাক ইডেন বিল্ডিংসে ফেরত দিতে হবে। তারপর যেতে হবে আমার বন্ধু কুমারশঙ্কর হাজরার বৌভাতের নিমন্ত্রণে। সুলতানকে যতোই বোঝাই, তাঁর একই জবাব—ম্যায় সুলতান হ্যাঁয়, কিসিকা হুকুম সে কোয়ি কাম নেহি করতা। হাম আপনা মর্জি সে হর কাম করতা।

দোসরা লোকটি সায় দিয়ে বলল, বিলকুল ঠিক, আপ তো সুলতান হ্যাঁয়।

এখন বুঝতে পারলাম, রাজ্জাক স্যারের অনুমান কতদূর সত্য।

সুলতানকে কোনোরকমে আসর থেকে টলাতে না পেরে অগত্যা আমি ট্রাকে উঠে বসে ড্রাইভারকে বললাম, গাড়ি স্টার্ট দিন। আমাদের পাঁচটার মধ্যে পৌঁছতে হবে। গাড়ি যেই আওয়াজ করে ধোঁয়া তুলে চলতে আরম্ভ করে কিছুদূর এগিয়ে এসেছে, পেছন থেকে সুলতানের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। ছফা ভাই, আমাকে ফেলে যাবেন না।

ছবিগুলো এনে রাজ্জাক স্যারের বাড়ির নিচের তলায় গুছিয়েগাছিয়ে রাখলাম। একটুখানি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। যাক ছবিগুলো বেঁচে গেলো। মাসখানেক পরে নড়াইল থেকে আবার সুলতান এলেন। এবার দেখলাম তাঁর কণ্ঠস্বর ভয়ানক বদলে গেছে। কার কাছে তিনি শুনেছেন তাঁর অবর্তমানে রাজ্জাক সাহেব তাঁর ছবিগুলো বেচে দিতে পারেন। সুলতান আবার জেদ করতে আরম্ভ করলেন, ছবিগুলো আবার ট্রাকে করে নড়াইলের বাড়িতে ফেরত দিয়ে আসতে হবে। আমি লজ্জায় স্যারকে মুখ দেখাতে পারছিলাম না। আমি জানতাম স্যার গোপনে সুলতানকে তিরিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। সুলতান তার প্রায় সবটা এলিফ্যান্ট রোডের সুরশ্রী থেকে বাদ্যযন্ত্র কিনে খরচ করে ফেলেছিলেন। আর সুলতানের ভুলে যাওয়ার ক্ষমতা অসাধারণ। যাহোক, রাজ্জাক স্যারকে আবার ট্রাকের ব্যবস্থা করতে হলো।

আড়াই হাজার কি তিন হাজার টাকা ভাড়া ছাড়া কেউ নড়াইল যেতে রাজি ছিলো না। ছবি তো সুলতান সাহেব নড়াইল নিয়ে গেলেন। ছবিগুলোর ভাগ্যে কী ঘটলো সেটাও একটু বলা প্রয়োজন। একবার একটা দীর্ঘস্থায়ী বন্যা হল। সুলতানের বাড়িতে খাবার নেই। তাঁর জীবজন্তুগুলো অনাহারে ধুঁকছে। এই নাজুক সময়টিতে চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ হোটেলের মালিক সুলতানের কাছে হাজির হলেন। মাত্র পঁচিশ হাজার টাকা সুলতানকে নগদে পরিশোধ করে ট্রাকে ভরে ছবিগুলো আবার চট্টগ্রামে নিয়ে যাওয়া হলো। ওই হোটেল–মালিকের কাছ থেকে চট্টগ্রামের শিল্পপতি এ কে খানের ছেলে পাঁচ–সাতটি ছবি কিনেছিলেন।

উনিশশো সাতাশি সালে গ্যোতে ইনস্টিটিউট সুলতানের ছবির একটা প্রদর্শনী করার উদ্যোগ নিয়েছিল। আমিও তার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। যাঁদের সংগ্রহে সুলতানের ছবি আছে প্রদর্শনের জন্য ধার হিসেবে ছবিগুলো সংগ্রহ করেছিলাম। সকলে সানন্দে তাঁদের ছবি দিয়েছেন। এ কে খান সাহেবের ছেলের কাছে যখন ছবিগুলো ধার দিতে চিঠি লিখলাম, তিনি জানালেন, দু লক্ষ টাকার ইন্সুরেন্স করতে হবে এবং প্রিমিয়ামের প্রথম ইনস্টলমেন্টের টাকা প্রদর্শনী কর্তৃপক্ষকে শোধ করতে হবে। অনেক ধরাপড়ার পর বিনা ইন্সুরেন্সে ছবিগুলো তিনি নিজের খরচে পাঠিয়েছিলেন এবং ফেরত নিয়েছিলেন। অবশ্য রাজ্জাক স্যারের ভ্রাতুস্পুত্র আবুল খায়ের লিটুর সঙ্গে সুলতান ছবি আঁকার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন। সে অনেক আগের ব্যাপার। সে বিষয়ে আমি কিছু বলবো না।

দশ

সালমান রুশদির লেখা ইংরেজি উপন্যাস মিডনাইট চিলড্রেনস ঢাকার বাজারে এসেছে। স্যার এক কপি কিনেছেন। পড়া শুরু করার পর থেকেই ভীষণ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন। পড়ছেন এবং তারিফ করছেন। ইংরিজি ভাষার ইডিয়াম ব্যবহারের পদ্ধতিটাই একেরে পাল্টাইয়া ফেলাইছে। এই এতদিন পরে ইন্ডিয়ানরা ইংরেজগো উপর প্রতিশোধ লইবার লাগছে। ইংরাজ আমলে ইন্ডিয়ায় যাঁরাই ইংরেজি লিখছেন, তার মধ্যে একমাত্র গান্ধী ছাড়া আর কারও লেখাই টিকব না।

আমি জওহরলাল নেহরুর কথা বললাম। স্যার মাথা নাড়লেন, উঁহুঁ টিকব না। তারপর মুলুকরাজ আনন্দের কথা বললাম। তাঁর ইংরিজি গদ্যের ব্যাপারেও স্যার দেখলাম আশাবাদী নন। সালমান রুশদির নাম উল্লেখ করে বললেন, এইরকম একজন ইংরেজি প্রোজ রাইটারের জন্ম কলোনিয়াল আমলে সম্ভব আছিল না। পইড়্যা ইংরেজদেরও নইড়্যাচইড়্যা বইতে অইব। সালমান রুশদির উপন্যাস নিয়ে যতোখানি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন, অন্য কোনো লোকের উপন্যাস সম্পর্কে স্যারকে অতোটা মুখর হতে আমি দেখিনি।

স্যার কয়েকদিন পর মফিদুল হকের বইয়ের দোকান জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনীতে ঘনঘন যাওয়া আসা করছেন। আমার কৌতূহল জাগলো, তাই একদিন জিগ্‌গেস করলাম, স্যার, আপনাকে ঘনঘন মফিদুলের দোকানে যাওয়া–আসা করতে দেখছি, নতুন বই আসার সম্ভাবনা আছে কি?

স্যার বললেন, মফিদুল আমারে দুই খণ্ড হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা অভিধান আইন্যা দেওনের কথা দিছে। অভিধানটা আইল কি না খবর লইবার যাই। একদিন সত্যি স্যার অভিধান দু খণ্ড নিয়ে বাড়িতে ফিরলেন। তারপর দেখা গেলো, শেলফ থেকে আরও পাঁচ-সাতটা অভিধান নামিয়ে এনে হরিচরণের অভিধানের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছেন। স্যারের নিবিষ্ট অভিধানচর্চা দেখে আমার কেমন জানি মনে হতে লাগলো, স্যার নিজেই একটা অভিধান রচনা করতে বসে যাবেন। কিছুদিনের মধ্যেই দেখলাম অভিধান দুটো শেলফে চলে গেছে। স্যার অন্য বই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

অনেক পরের ঘটনা। তবু এখানে বলে ফেলি। কবি সমর সেন মারা গেছেন। সমর সেন তরুণবয়সে কবিখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। পত্রিকায় ঘোষণা দিয়ে তিনি কবিতা লেখা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ফ্রন্টিয়ার নামে একটি সাপ্তাহিক ইংরেজি পত্রিকার সম্পাদনা করে গেছেন। মতামতের ব্যাপারে সমরবাবু কারও সঙ্গে আপোস করেননি। তার জন্য তাঁকে কম বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়নি। সমরবাবুর মৃত্যুর পর তাঁর ওপর তাঁর গুণমুগ্ধ বন্ধুবান্ধবেরা একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেন। সমর সেনের পুরোনো লেখাগুলোও একটি গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। তা ছাড়া সমর সেনের আত্মজৈবনিক রচনা বাবু বৃত্তান্ত বইটিও তিনি কিনে এনেছেন। কয়েকদিন দেখলাম স্যার খুব মনোযোগ দিয়ে সমরবাবুর লেখা, তাঁর ওপর লিখিত রচনাগুলো পড়ছেন। এবার স্যারের বাড়িতে যেতে কিছুদিন দেরি হলো। মাঝখানে অসুখে পড়েছিলাম। স্যার আমাকে দেখামাত্রই সমর সেনের নিজের লেখা এবং তাঁর ওপর লেখা বই শেলফ থেকে এনে টেবিলে রাখলেন। আমার দিকে তাকিয়ে জিগ্‌গেস করলেন, আপনে সমর সেনের লেখা পড়ছেন?

আমি বললাম, কবিতা তো অবশ্যই পড়েছি অনেক আগে। সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত 'বাবু বৃত্তান্ত' এই সবে শেষ করেছি।

স্যার বললেন, আটাশ, উনত্রিশ বছর বয়সের পর এই ভদ্রলোক আর বাংলা ভাষায় কিছু লিখেন নাই। যে বয়সে সমর সেন বাংলা লেখা ছাড়ছেন, ওই বয়সের রবীন্দ্রনাথের লেখার সঙ্গে মিলাইয়া দেখবেন, কোনো তুলনা চলব না। দুঃখের কথা অইল সমর সেন তিরিশ বছর বয়সের পর আর কোনোকিছু বাংলা ভাষায় লিখেন নাই। যাও লিখছেন ইংরেজিতে। এইডা বাংলা ভাষার জন্য একটা গ্রেট লস। এই একটা মানুষ যার চিন্তাভাবনার রেঞ্জ আছিল অনেক বড়।

টাঙ্গাইলের থেকে আসা স্যারের এক পূর্বপরিচিত প্রবীণ ভদ্রলোককে দেখলাম স্যারের সঙ্গে আলাপ করছেন। পুরোনো দিনের প্রসঙ্গ সব। আবদুল হালিম গজনভির কথা উঠলো, সেই সূত্র ধরে এলেন ওয়াজেদ আলি খান পন্নী। একসময় মওলানা ভাসানীর কথাও উঠলো। স্যার বললেন, একসময় মওলানা ভাসানী মেডিক্যাল কলেজে ভরতি অইছিলেন। তাঁর ত আবার দুই রকমের অসুখ আছিল। পলিটিক্যাল অসুখ আর আসল অসুখ। সেইবারের অসুখটা মনে অইল আসল অসুখ। আমি তাঁরে দেখতে হাসপাতালে গেলাম। আমারে দেইখ্যা মওলানা সাহেব খুশি অইল। এই কথা সেই কথা নানান কথা কইবার লাগল। মওলানা কথা কইবার শুরু করলে অন্য মানুষের শুইন্যা যাওন ছাড়া গতি আছিল না। মওলানা এক পর্যায়ে কইলেন, আমি একটা কলেজ দিছি, একটা মাদ্রাসা দিছি। তারপর কইলেন দুইডা হাই স্কুল দিছি, একটা ব্যাটাছেলেদের একটা মেয়েদের। আমি কইলাম এই কামডা ভালা করছেন। মওলানা সায়েব শুইয়া শুইয়া কথা কইতে আছিলেন। আমার কথা শুইন্যা উইঠ্যা বইলেন। আমার চৌকের ওপর চৌক রাইখ্যা কইলেন তুমি কী কইবার চাও। আমি জবাব দিলাম স্কুল দুইডা কইর‍্যা ভালা করছেন। মওলানা সাহেবের সেন্স আছিল খুবই কীন। আকারে ইঙ্গিতে কথা কইলেও ঠিক বুইঝ্যা নিতে পারতেন।

তারপর স্যার বেঙ্গলের শিক্ষাব্যবস্থার ওপর আলোচনা করতে লেগে গেলেন। তিনি বললেন, বেঙ্গলের এন্টায়ার এডুকেশন সিসটেমটাই টপ হেভি। এইখানে সাপোর্টিং কোনো কলেজ তৈয়ার করনের আগে এইটিন ফিফটি এইটে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি তৈয়ার অইছে। একই রকম সাপোর্টিং স্কুল ছাড়া কলেজগুলা তৈয়ার অইছে। অখন গ্রামেগঞ্জে যেখানে যাইবেন দেখবেন কলেজ অইতাছে। এইগুলা কোনো কামে আইব না। আমাগো দরকার শক্তিশালী মিডল স্কুল। শিক্ষার আসল জায়গাটাতেই নজর পড়ছে না কারও। বাঙালিদের যেরকম ডিগ্রির ক্রেজ, এইডা নতুন কোনো কিছু নয়। কলেজ তৈরি করার আগে

ইউনিভার্সিটি তৈয়ার করার কারণে এই ক্রেজ জন্মাইছে। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির বাইরে ইন্ডিয়ার অন্য কোনো অঞ্চলে এই ক্রেজ পাইবেন না।

স্যারের শিক্ষাসম্পর্কিত আলোচনা শেষ হলে আমি শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে স্যারের মতামত জানতে চাইলাম। তখনও শেখ সাহেব বেঁচে আছেন। স্যার একটু নড়েচড়ে বসলেন। তারপর বললেন নাইন্টিন সিক্সটি নাইন থেইক্যা সেভেন্টি ওয়ান পর্যন্ত সময়ে শেখ সাহেব যারেই স্পর্শ করছেন, তার মধ্যে আগুন জ্বালাইয়া দিছেন। হের পরের কথা আমি বলবার প্যারুম না। আমি গভর্নমেন্টের কারও লগে দেখাসাক্ষাৎ করি না। সেভেন্টি টুতে একবার ইউনিভার্সিটির কাজে তাঁর লগে দেখা করতে গেছিলাম। শেখ সাহেব জীবনে অনেক মানুষের লগে মিশছেন ত আদব লেহাজ আছিল খুব ভালা। অনেক খাতির করলেন। কথায়–কথায় আমি জিগাইলাম, আপনের হাতে ত অখন দেশ চালাইবার ভার, আপনে অপজিশনের কী করবেন। অপজিশন ছাড়া দেশ চালাইবেন কেমনে। জওহরলাল নেহরু ক্ষমতায় বইস্যাই জয়প্রকাশ নারায়ণরে কইলেন, তোমরা অপজিশন পার্টি গইড়্যা তোল। শেখ সাহেব বললেন, আগামী ইলেকশানে অপজিশান পার্টিগুলা ম্যাক্সিমাম পাঁচটার বেশি সীট পাইব না। আমি একটু আহত অইলাম, কইলাম, আপনে অপজিশনরে একশো সিট ছাইড়্যা দেবেন না? শেখ সাহেব হাসলেন। আমি চইল্যা আইলাম। ইতিহাস শেখ সাহেবরে স্টেট্সম্যান অইবার একটা সুযোগ দিছিল। তিনি এইডা কামে লাগাইবার পারলেন না।

দিন তারিখ সাল এসব আমার মনে থাকে না। আর আমি স্মৃতি থেকেই এসব কথা লিখছি। অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক ড. মজহারুল হক মারা গেছেন। ড. হকের মৃত্যু রাজ্জাক স্যারকে খুব জখম করেছে। বারবার স্যার অর্থনীতি সম্মেলনে দেয়া তাঁর ভাষণটির কথা বলছিলেন। সেই সময়ে সাহস করে ড. হক অনেকগুলো সত্য কথা বলেছিলেন, যা সকলের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠতে পেরেছিল। ড. হক রাজ্জাক স্যারের সতীর্থ কি ছাত্র ছিলেন, সে খবর আমি কখনো তাঁকে জিগ্গেস করিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, শেখ মুজিবুর রহমান সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ড. মোজাফ্ফর আহমদ চৌধুরীর মৃত্যুতেও তাঁকে অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে উঠতে দেখেছি। মোজাফফর সাহেব ছিলেন রাজ্জাক স্যারের ছাত্র। অত্যন্ত স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতেন। অন্য মানুষের কাছে আমি শুনেছি মোজাফফর সাহেব যখন উনিশশো বাহান্ন সালে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার কারণে জেলে গিয়েছিলেন, রাজ্জাক স্যার তাঁর পরিবারের আংশিক দায়দায়িত্ব বহন করতেন।

উনিশশো আটাত্তর কি উনআশি সালের দিকে হবে। কানাডার টরেন্টো কী অন্টারিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির শিক্ষক প্রফেসর ওয়াহিদুল হক রাজ্জাক স্যারের বাড়ির নিচতলায় থাকতে আরম্ভ করেন। তিনি জিয়া সরকারের মন্ত্রী–টন্ত্রী কিছু একটা হয়ে যাবেন এরকম গুজব শোনা যাচ্ছিলো। পরে অবশ্য তিনি এরশাদ সরকারের অর্থমন্ত্রী হয়েছিলেন। সে অনেক পরের ব্যাপার। জিয়ার আমলে তিনি যখন এসেছিলেন, রাজ্জাক স্যারের বাড়িতে থাকতেন এবং আহারাদি করতেন। স্যারের বাসায় যাওয়া–আসা করতে গিয়ে ওয়াহিদুল হক সাহেবের সঙ্গে আমারও একরকম চেনাজানা হয়েছিল। সেবার তিনি দুমাসের মতো ছিলেন। ওয়াহিদুল হক সাহেব চলে যাওয়ার পর স্যারের কাছে একটা তদবির নিয়ে গেলাম। আমাদের চেনাজানা একটি ছাত্র কানাডার কোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করছিলো। ওয়াহিদুল হক সাহেবের মতো একজন নামকরা প্রফেসরের কাছ থেকে যদি একটা সুপারিশপত্র আদায় করা যায়, ছাত্রটির ভরতি হওয়ার পথ সহজ হয়। স্যারকে সমস্ত ব্যাপারটি খুলে বলেছিলাম। শুনেই স্যার মাথা দুলিয়ে বললেন, আমি পারুম না।

আমি কিছুতেই বুঝতে পারলাম না স্যার এরকম অস্বীকার করলেন কেনো। তাঁর একটা অনুরোধে যদি ছাত্রের উপকার হয় স্যার সে কাজটি করতে অসম্মত হবেন কেনো? অতীতে আমি অনেককেই এরকম সাহায্য করতে দেখেছি। আমার ধারণা হলো, স্যার না বললেও ভালো করে চেপেচুপে ধরলে শেষ পর্যন্ত তিনি ওয়াহিদুল হক সাহেবকে একটা চিঠি লিখবেন। এক সপ্তাহের মধ্যে অনুরোধটা আমি তিন–চারবার করলাম। একদিন স্যার মহা বিরক্ত হয়ে বললেন, এইখান থেইক্যা যাওনের পর ওয়াহিদুল হক আমার কাছে একখান পোস্টকার্ডও লেখেন নাই। এইবার আসল ব্যাপার বুঝলাম।

প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ মরহুম ড. আবু মাহমুদও লিবিয়া থেকে আসার পরে রাজ্জাক স্যারের বাড়িতে থাকতেন। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ড. মাহমুদের চাকুরি ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষক উপাচার্য ড. ফজলুল হালিম চৌধুরীর সঙ্গে ড. আবু মাহমুদকে পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করার আবেদন জানান। সেই আবেদনের কারণেই ড. আবু মাহমুদকে আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপত্র দেয়া হয়। নতুনভাবে চাকুরিতে যোগ দেয়ার পর ড. আবু মাহমুদকেও রাজ্জাক সাহেবের নামে অনেক আজেবাজে কথা বলতে শুনেছি। প্রফেসর ওয়াহিদুল হক কিংবা ড. আবু মাহমুদকে অহেতুক খাটো করে দেখানো অথবা প্রফেসর রাজ্জাককে তাঁদের তুলনায় মহৎ করে দেখানোর জন্য এ বিষয়গুলোর উল্লেখ করা হচ্ছে না।

রাজ্জাক স্যারের কাছাকাছি থাকার সময় যেসব ব্যাপার আমি নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছি এবং যেগুলো স্মৃতি থেকে এখনও হারিয়ে যায়নি, সেগুলো প্রকাশ করা আমার একটা দায়িত্বও বটে। মুখ্যত সে কারণেই প্রফেসর ওয়াহিদুল হক এবং ড. আবু মাহমুদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম। স্যারকে এ নিয়ে কখনো উচ্চবাচ্য করতে আমি শুনিনি।

এগারো

একদিন আজিজুল হক সাহেবকে নিয়ে স্যারের বাড়িতে গেলাম। তিনি তখন গুলশানে থাকছেন। শীতকাল। স্যার একখানা কাঁথা–গায়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে ম্যাগনিফায়িং গ্লাস দিয়ে কী একটা অতি পুরোনো হলদে হয়ে আসা বই পড়ছেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি কমে এসেছে। প্রথম দৃষ্টিতে মানুষ চিনতে তাঁর কষ্ট হয়। কণ্ঠস্বর শুনেই আজিজুল হক সাহেব খুব কাছে গিয়ে স্যারকে বললেন, মনে হচ্ছে স্যার অত্যন্ত জরুরি কিছু তালাশ করছেন।

স্যার চিরাচরিত সেই হাসিটা হাসলেন। একটুখানি ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠে বললেন, বয়েন। তারপর চেয়ার হাতড়াতে লাগলেন।

আজিজুল হক সাহেব বললেন, স্যার, আপনার পেরেশান হওয়ার প্রয়োজন নাই। এই যে চেয়ার আছে বসতাছি।

আমরা যখন বসলাম, আজিজুল হক সাহেব রসিকতা করে বললেন, যেভাবে কাঁথাকুঁথা গায়ে লাগাইছেন মনে হয় স্যারের খুব শীত লাগছে।

স্যার কবুল করলেন। হ শীত একটু লাগছে। অখন কী খাইবেন কন।

খাওনের লাইগ্যা আপনার এমন উতলা হওয়ার প্রয়োজন নাই। কী বই পড়ছেন কন।

স্যার পঠিত পৃষ্ঠাতে একটি চিহ্ন দিয়ে বইটি সন্তর্পণে বন্ধ করলেন। অতি পুরোনো বই। নাড়াচাড়া করলেই ঝুরঝুর করে পাতা ঝরে পড়ে। স্যার বললেন, জন অ্যাডামসের রিপোর্টটা দেখতাছি। বইটা এখন দুষ্প্রাপ্য অইয়া গেছে। আমার কাছে এক কপি আছে।

হক সাহেব বললেন, নতুন খবর পাইলেন?

স্যার বললেন, নতুন কিছু নয়, খবর সব পুরানা। বেঙ্গলের সবচাইতে মিসফরচুন ব্যাপার অইল, এইখানে সাপোর্টিং কলেজ অওনের আগে য়্যুনিভার্সিটি তৈয়ার অইছে। আর মিডল স্কুল তৈয়ার না কইর‍্যা কলেজ বানাইছে। গুরু থেইক্যাই বেঙ্গলের এড়ুকেশন সিসটেমটা আছিল টপ হেভি। হের লাইগ্যা এইখানে ডিগ্রির লাইগ্যা মানুষের একটা ক্রেজ জন্মাইছে। আমাগো সময় পর্যন্ত সেই জিনিসটা চালু রইছে। গ্রামে গঞ্জে যেখানেই যাইবেন, দেখবেন কলেজ জন্মাইতেছে। অখন আমাগো দরকার শক্তিশালী মিডল স্কুল। হেইদিকে কারও নজর নাই।

এরই মধ্যে কাজের ছেলেটা বাকরখানি এবং মাংসের দুটো প্লেট দিয়ে গেলেন। আজিজুল হক সাহেব ছেলেটিকে বললেন, স্যারের প্লেট কই?

তিনি বললেন, আমি একটু আগে খাইছি, আপনেরা খান।

আমরা খাচ্ছিলাম এবং স্যারের কথা শুনছিলাম। মিডল স্কুলের সূত্র ধরেই স্যার বলছিলেন, গ্রেট ব্রিটেনের বাজেটে ডিফেন্সের চাইতে এড়ুকেশনে বেশি অর্থ অ্যালট করা হয়। এখন দেখতে পাইবেন, এভারেজ ইংলিশ চিলড্রেনরে স্কুলে বাধ্যতামূলকভাবে এক পাউন্ড দুধ খাইতে দেয়। হের লাইগ্যা এভারেজ ইংলিশ চিলড্রেনের হেলথ মাচ বেটার দ্যান ওয়াজ ইন দ্যা টাইম অভ এম্পায়ার।

আমরা খাওয়া যখন শেষ করেছি, স্যার নতুন প্রকাশিত একটি বাংলা বই নিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। অমলেশ ত্রিপাঠির ভারতের জাতীয় কংগ্রেস পার্টির ইতিহাস বইটি সবে প্রকাশিত হয়েছে। ভদ্রলোক কিছুদিন আগে বাংলাদেশে এসেছিলেন। সে সময়ে তাঁর এক ছেলে বাংলাদেশে ভারতের ডেপুটি হাই কমিশনার ছিলেন। অমলেশবাবুকে বাংলা একাডেমীর তরফ থেকে একটি সংবর্ধনা দেয়া হয়েছিলো। ওটা বোধহয় কূটনৈতিক গুরুত্বের কারণেই দেয়া হয়েছিলো। হক সাহেব জিগ্‌গেস করলেন, কেমন লাগল ত্রিপাঠির বই?

স্যার মুখের একটা বিশেষ ভঙ্গি করে বললেন, এক্কেরে মনগড়া সব কথা লেইখ্যা থুইছে।

আমি বললাম, অমলেশবাবুর লেখাটা যখন দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিলো, ছেচল্লিশের রায়ট নিয়ে খুব বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। আরও একটি সাময়িক পত্রিকা চতুরঙ্গেও এ নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হয়েছে। সে সময়ে যে সব ইন্ডিয়ান আইসিএস অফিসার ছিলেন, তাঁদের মধ্যেও অনেকে অংশগ্রহণ করেছিলেন। অন্নদাশঙ্কর রায় প্রমুখ ব্যক্তি চল্লিশের দাঙ্গার জন্য মুখ্যত হোসেন শহীদ সুহ্‌রাওয়ার্দিকে দায়ী করেছেন। সুহ্‌রাওয়ার্দি সাহেব মুসলিম পুলিশদের দিয়ে দাঙ্গা করিয়েছিলেন।

রাজ্জাক স্যার মন্তব্য করে বসলেন, সুহরাওয়ার্দি সাহেব পুলিশ দিয়া দাঙ্গা করাইছেন, উনারা যখন কইতাছেন, হাঁচা কইতাছেন মাইন্যা নিলাম। এই কথা ত তাঁরা নতুন কইতাছেন না। ফরটি সিক্স থেইক্যাই কইতাছেন। কিন্তু আমার কথা অইল নাইনটিন ফরটি সিক্স–এ ক্যালকাটায় মুসলিম পুলিশের সংখ্যা আছিল কত? ওয়ান ফোর্থও না। সুহরাওয়ার্দি সাহেব যদি মুসলিম পুলিশের সাহায্য লইয়াও থাকেন, তাগো নাম্বার ওয়ান ফোর্থের অধিক না। বাকি পুলিশ সব আছিল হিন্দু আর শিখ। তারা ত বইয়া আছিল না, তারা কী করছিল?

স্যার তারপর সুহরাওয়ার্দি সাহেব সম্বন্ধে বলতে আরম্ভ করলেন। সুহরাওয়ার্দি সাহেব নামে আছিলেন মুসলিম এবং মুসলিম লীগার। তাঁর খাওন উঠাবসা সব আছিল হিন্দু ভদ্রলোকদের সাথে। বিধান রায়, শরৎ বসু এইসব মানুষদের সঙ্গে তিনি চলাফেরা করতেন। তাঁর পার্সোনেল ফ্রেন্ডদের অনেকেই আছিলেন হিন্দু। যতোবারই রাজ্জাক স্যার সুহরাওয়ার্দির প্রসঙ্গ উথাপন করেছেন, মনে করিয়ে দিতে ভুল করেননি সুহরাওয়ার্দি টাইটেলটা নকল। এবারেও তার পুনরাবৃত্তি করলেন। তারপর সুহরাওয়ার্দি সম্পর্কে আরও কিছু মজার গহন সংবাদ পরিবেশন করলেন। আমি বারবার জানতে চাইছি সুহরাওয়ার্দি সাহেবের আসল প্রফেশনটা কী ছিল।

আমি বললাম, উনি ত লইয়ার ছিলেন। স্যার হাসলেন, হেইডা ত মাইনষে জানে। কিন্তু তিনি ত প্র্যাকটিস করতেন না।

আমি মিনা পেশোয়ারির নামটা উচ্চারণ করলাম।

স্যার বললেন, স্পেসিফিক নামটাম কইবার পারুম না।

আকাশে চড়চড়ে রোদ উঠেছে। তিনি গায়ের থেকে কাঁথাটা খুলে চেয়ারের হাতায় রাখলেন। তারপর হুঁকোর নলটা তুলে নিয়ে টানতে আরম্ভ করলেন।

আজিজুল হক সাহেব বললেন, স্যার আপনি যে হুঁকা টানতাছেন, কল্কিতে ত তামুক দেওয়া নাই।

স্যার বললেন, আইজকাল এইরকমই। ডাক্তার তামুক এক্কেরে না করছে। যখন ইচ্ছা অয়, এমনি দুয়েকটা টান দিয়া দেখি।

কথায়–কথায় ভারতের প্রসঙ্গ উঠল। স্যার উনিশশো সাতচল্লিশ সালে আমেরিকা থেকে প্রকাশিত লাইফ ম্যাগাজিনের একটা কভারের কথা বললেন : হেইবার লাইফ ম্যাগাজিন ইন্ডিয়ার ইনডিপেন্ডেন্সের ওপর একটা কভার স্টোরি করছিলো। অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানে নেহরু খালি গায়ে বইস্যা মন্ত্র পড়ছেন। তাঁরে ঘিইর‍্যা বইয়া আছেন মন্ত্রিমণ্ডলী বেদির চাইরপাশে। বেদি থেইক্যা দূরে খাড়াইয়া আছেন দুইটা মানুষ—আম্বেদকর আর মাওলানা আবুল কালাম আজাদ। অনুষ্ঠানটা অইতাছে বেদের নিয়মানুসারে। সেইখানে অহিন্দুর

থাকনের পারমিশন নাই। লাইফ ম্যাগাজিন একটা মজার ক্যাপশন দিছিল—বার্থ অব এ সেক্যুলার স্টেট।

মাওলানা আবুল কালাম আজাদের প্রসঙ্গ ওঠায় রাজ্জাক স্যার মন্তব্য করলেন, মাওলানার সত্য কথা বলার অভ্যাস আছিল খুব কম, অ্যান্ড হি ওয়াজ এ কনজেনিটাল লায়ার। তরজুমানুল কোরআন যে বইটা মাওলানা লিখছেন, ইন্ডিয়াতে সেইটারে মাওলানার মস্ত কীর্তি বইল্যা দেখান অয়, অ্যারাব ওয়ার্ল্ডের কোনো জায়গায় কোথাও এই বইয়ের কোনো ম্যানশন নাই। আরবরা ইন্ডিয়াতে লেখা যে বইটার উপর গুরুত্ব দিয়া থাকেন, হেইডা অইল ফতোয়ায়ে আলমগীরী। তারপর রাজ্জাক স্যার আধুনিক ভারতের ভাষা–সমস্যার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, আইজকার ইন্ডিয়ার এডুকেটেড মানুষেরা যে ভাষায় পরস্পরের লগে কম্যুনিকেট করেন, হেইডা কোনো ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ না। তাঁরা ইংরেজির মাধ্যমেই পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করেন। বৃটিশের চইল্যা যাইবার পঞ্চাশ বছর পরেও যারা একটা লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা তৈয়ার করতে পারে নাই, তারা একলগে থাকব কী কইর‍্যা আমি ত চিন্তা করবার পারি না।

রাজ্জাক স্যার তাঁর স্কুলজীবনের স্মৃতিচারণ করতে আরম্ভ করলেন। আমার বাবা আছিলেন পুলিশ অফিসার। বদলির চাকুরি। তিনি বহরমপুরে পোস্টিং পাইলেন। আমরা তিন ভাই বহরমপুর স্কুলে আইস্যা ভরতি অইলাম। টোটাল ছাত্রসংখ্যা আছিল পাঁচশত। মুসলিম ছাত্র হবায় আমরা তিন ভাই। হেই সময়ে স্যার যদুনাথ সরকারের হিস্ট্রি অভ আওরঙ্গজেব বইটা বাইর অইছে। স্কুলে থাকনের সময়ে আমি বইটা পড়ি। অ্যান্ড স্যার যদুনাথ ওয়াজ এ গ্রেট স্কলার। তিনি আওরঙ্গজেবের অনেক সদগুণের উল্লেখ করছেন। লম্বা ফিরিস্তির পর একটা বাট লাগাইয়া লিখলেন, ইসলাম ধর্মের উপর অত্যন্ত নিষ্ঠার জন্য এইরকম একজন সম্রাটের নানাবিধ গুণ কোনো কামে আইল না। এই অংশটা পইড়্যা মুখটা তিতা অইয়া গেল।

বারো

স্যার অনেক দূরে থাকেন। আমাদের পক্ষে ঘনঘন যাওয়া সম্ভব হয় না। কাজ–কর্মে ফাঁক পেলে স্যারের বাড়িতে হামলা করি। অনেকদিন থেকে রাজ্জাক

স্যার হেলু চাচির বাড়িতে থাকছেন। হেলু চাচি হলেন রাজ্জাক স্যারের ছোটো ভাই মরহুম খালেক সাহেবের বেগম। আবুল খায়ের লিটুর মা। কয়েক বছর ধরে তিনি তাঁর অপর পুত্র এবং স্যারসহ আলাদা বাড়িতে থাকছেন। গুলশানের একশো নম্বর রাস্তার তিরিশ নম্বর বাড়িতে তাঁরা সবাই থাকেন। সেবার আমার সঙ্গে তরুণ অর্থনীতিবিদ বিআইডিএস–এর সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. হোসেন জিল্লুর রহমান ছিলেন। তা ছাড়া ছিল একজন তরুণ লেখিকা। নাম সেলিনা শিরিন সিকদার। সে স্যারের ওপর একটি ভিডিও ফিল্ম তৈরি করছে। আমাদের যেতে যেতে অনেক বেলা হয়েছিলো। আমরা একটুখানি ইতস্তত করছিলাম। স্যার মাত্র কদিন আগে সিঙ্গাপুর থেকে ফিরেছেন। চোখের চিকিৎসার জন্য তাঁকে সেখানে নেয়া হয়েছিলো। স্যার জানতেন তাঁর নানা সময়ের কথাবার্তাগুলো আমি লিখছি। আগে যেটুকু লিখেছি তার কম্পিউটার টাইপ করা অংশ স্যারকে দেখালাম। তিনি এক ঝলক দেখে শিটগুলো সরিয়ে দিয়ে বললেন, যা খুশি লেখবার চান লেখেন।

আমি প্রশ্ন করলাম, স্যার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তো আপনি অনেকদিন ছিলেন, বলতে গেলে গোটা জীবনটাই কাটিয়ে দিয়েছেন। আপনি নিজে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। একসময়ে তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে অনেক নামকরা মানুষ ছিলেন। কোন কোন শিক্ষককে এখন আপনার সবচাইতে উজ্জ্বল মনে হয়।

স্যার বললেন, আমাগো সময়ে সত্যেন বসু ছিলেন। তিনি ফিজিক্সের মানুষ অইলেও অন্যান্য বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য আছিল অগাধ। যে–কোনো বিষয়ে তার ব্যাপক পড়াশোনা আছিল। এমন মানুষ আর একটাও দেখা যায় না। সাহিত্যের উপরও তাঁর দখল আছিল খুব। আমরা যখন ভরতি অইছি, তখন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রিটায়ার করছেন। আমরা মোহিতলাল মজুমদাররে পাইছি। মোহিতলালবাবু বড় স্কলার আছিলেন। কিন্তু জিভটা আছিল বড় খারাপ। অকারণে মাইনষেরে তুচ্ছ–তাচ্ছিল্য করতেন। এস. কে. দে মানে সুশীলকুমার দে আছিলেন, অত্যন্ত উচ্চশ্রেণীর মানুষ হিসাবে এবং স্কলার হিসাবে। তারপর আমার ডাইরেক্ট টিচার আছিলেন অমিয়বাবু। অমিয়বাবু মানে অমিয় দাশগুপ্ত। বরিশালের মানুষ। এইখান থেইক্যা তিনি দিল্লি চইল্যা যান। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে কেউ–কেউ নোবেল প্রাইজ পাইবার যোগ্য অইছে। এই যে অমর্ত্য সেনের কথা সকলে কয়, তিনিও ত অমিয়বাবুর ছাত্র। এইরকম আরও অনেক আছেন। বাংলাদেশ হওনের পর একবার তিনি এই দেশে আইছিলেন। জিল্লুরের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনেগো বিআইডিএস–এর একটা সেমিনার অ্যাটেন্ড

করনের লাইগ্যা, তখন আমার এখানে আছিলেন। এইবারও আওনের কথা আছিল। রেহমান সোবহানের মাধ্যমে আমারে খবর দিছিলেন, রাজ্জাকরে কইবেন; এইবারও আমি তার ওইখানেই থাকুম। হে যেন ব্যবস্থা করে। যেদিন আইব তার একদিন আগে হার্টফেল কইর‍্যা ... স্যার চুপ করলেন।

বুঝলাম অমিয়বাবুর এই আকস্মিক মৃত্যু তাঁর মনে খুব লেগেছে। আগেও তাঁকে নানা মানুষের সঙ্গে আমি অমিয় দাশগুপ্তের ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে শুনেছি। আজিজুল হক সাহেবের সঙ্গে আলাপ করতে আমি শুনেছি, এবার অমিয়বাবু যখন ঢাকা আসবেন, অমিয়বাবুকে সম্মানসূচক ডি লিট দেয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করবেন।

আমি আলোচনার মোড় আমাদের সময়ের দিকে ঘুরিয়ে আনলাম। জিগ্‌গেস করলাম, স্যার, ড. আহমদ শরীফকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করেন? স্যার বললেন, শরীফ ত্যারাবাঁকা কথা বেশ কয়। কিন্তু একসময় ত কাম করছে। হি ডিড মেনি থিংস। টেবিলের ওপর প্রফেসর আবদুল হাইয়ের একটা জীবনীগ্রন্থ দেখিয়ে আমাকে জিগ্‌গেস করলেন, আবদুল হাই সম্পর্কে আপনেরা কী ভাবেন?

আমি জবাব দিলাম, হাই সাহেব আমার শিক্ষক ছিলেন। তাঁর বিষয়ে আমার অনেক মধুর স্মৃতি আছে। শিক্ষক হিসেবে তিনি অত্যন্ত মহৎ ছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গে প্রথম দিনের ক্লাসের স্মৃতি হাতড়ে বললাম, তিনি বলতেন পাঁচ 'ব'তে শিক্ষক। বিনয়, বপু, বাচন, বাৎসল্য ইত্যাদি।

স্যার বললেন, সাহিত্য পত্রিকা বাইর করতেন অত্যন্ত উচ্চমানের। ঠিক সময়ে পত্রিকা বাইর অয় না দেইখ্যা অনেক রাগারাগি করছি। হাই সাহেবরে অনেক বকছিও।

বাংলা ডিপার্টমেন্টটা ভালাই চলছিল। এই দুইজন টিচার আইস্যা বেবাক পরিবেশ বরবাদ কইর‍্যা দিল। স্যার একজন মহিলা এবং একজন পুরুষ শিক্ষকের নাম উল্লেখ করলেন। আমি বদরুদ্দীন উমর সম্পর্কে স্যার কী ভাবেন জানতে চাইলাম।

স্যার বললেন, উমর যদি পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন এবং তৎকালীন রাজনীতি কেবল এই একটা বইই লিখতেন, তা অইলেই পস্টারিটি তার নাম স্মরণ করার জন্য যথেষ্ট। সে ত আরও অনেক কাম করছে। উমরের একটা ঋজু খাড়া চরিত্র আছে, বিশ্বাস অনুসারে চলবার চেষ্টা করে। আমাগো সমাজে এইরকম মানুষ ক'জন আছে।

তারপর আমি ঐতিহাসিক সালাহউদ্দিন আহমদ সম্পর্কে স্যারের মত জানতে চাইলাম।

স্যার বললেন, আগাগোড়া ভালা মানুষ। তাঁর বউ খালেদা সালাহউদ্দিন বেশ লেখাপড়া জানেন। তারপর আমি ইংরেজি বিভাগের ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন সম্পর্কে জানতে চেয়ে বললাম, স্যার, একটা সময়ে তো সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন আপনার খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। সাজ্জাদ সাহেব সম্পর্কে আপনি কী চিন্তা করেন?

স্যার বললেন, সাজ্জাদরে আমি খুব পছন্দ করতাম। একবার য়্যুনিভার্সিটিতে একটা প্রোভাইস চ্যান্সেলর অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিবার কথা অইল। ভাইস চ্যান্সেলর মাহমুদ হোসেন আমারে কইলেন, আপনে তিনটা নাম ঠিক করেন, আমি তিনটা নাম ঠিক করি। আমি যে লিস্ট করছিলাম, তাতে সাজ্জাদের নাম আছিল দুই নম্বরে। পরে মাহমুদ হোসেনের লিস্টের সঙ্গে মিলাইয়া দেখলাম, তিনিও সাজ্জাদরে দুই নম্বরে রাখছেন। মাহমুদ হোসেন সাহেব আমারে জিগাইলেন, সাজ্জাদের ব্যাপারে আমার লগে আপনের মতামত মিইল্যা গেল। আপনে কী কারণে সাজ্জাদরে দুই নম্বরে রাখছেন? আমি কইলাম, পয়লা আপনের মতটা শুনি, তারপরে আমারটা কমু। মাহমুদ সাহেব কইলেন, সাজ্জাদ'স আদার কোয়ালিফিকেশনস আর অলরাইট। বাট হি ল্যাকস চ্যারিটি। যার মনে দয়া নাই তারে উপরে আনা ঠিক নয়। আমি কইলাম, আমিও সাজ্জাদের ব্যাপারে এটজ্যাকলি একই কথা চিন্তা করছিলাম। তারপর থেইক্যা সাজ্জাদের লগে আমার রিলেশন খারাপ অইয়া গেল। এখানে উল্লেখ করা বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন সাহেব ইংরেজিতে যে আত্মজীবনী লিখেছেন, তাতে রাজ্জাক সাহেবের নামে অনেক নালিশ করেছেন।

সাজ্জাদ হোসেন পর্ব শেষ হওয়ার পর আমি বললাম, স্যার, সৈয়দ আলি আহসান সম্বন্ধে কিছু বলেন।

স্যার এভাবে শুরু করলেন। সাজ্জাদ অ্যান্ড আলি আহসান, আলি আশরাফ, দে আর কাজিনস্। সাজ্জাদ অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস পাইছিলেন, এম.এ-তে সেকেন্ড ক্লাস। আর আলি আশরাফ অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস, এম.এ-তে সেকেন্ড ক্লাস। আলি আহসান এম.এ. এবং অনার্স দুইটাতেই সেকেন্ড ক্লাস। তাঁর কনসেপশন্ খুব ক্লিয়ার আছিল। অ্যাসথেটিকস সেন্স খুব কীন। যে-কোনো বিষয়ে কলম ধরলেই লেখা অইয়া যাইত। আলি আশরাফের লেখার হাত ভালা আছিল না। ধর্মটর্ম খুব করতেন। তবে আলি আহসানের ব্যাপারে একটা কথা অইল সত্য কথা কদাচিৎ বলতে পারতেন। আমি আলি আহসানরে আত্মজীবনী লেখার পরামর্শ দিছি। কইছি, এখন ত সব সত্য কথা আপনে কইবার পারবেন না। লেইখ্যা রাইখ্যা যান। আপনের মরণের পর প্রকাশ অইব।

প্রফেসর রেহমান সোবহানের সঙ্গে রাজ্জাক সাহেবের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এই পণ্ডিত ভদ্রলোকটিকে আমি বিশেষ পছন্দ করি না। স্যারের তাঁর প্রতি অত্যন্তক অনুরাগের কারণটা কী জানতে চাইলাম।

স্যার বললেন, মানুষ হিসাবে রেহমান সোবহানরে কারও বিরুদ্ধে কোনো খারাপ মন্তব্য করতে শুনি নাই। তাঁর বাপ আছিল কেনিয়ার পাকিস্তান হাই কমিশনার। মরবার আগে ভদ্রলোক আরেকটা বিয়া কইর‍্যা ফেলাইছিল। স্বামীর মরণের পর ঐ ভদ্রমহিলা খুব ভয়ে ভয়ে আছিল। পাছে সৎ ছেলেরা তারে প্রপার্টি থেকে ডিপ্রাইভ করেন। রেহমান আর ফারুক তারা দুই ভাই। ভদ্রমহিলারও একটা বাচ্চা আছিল। রেহমান বিদেশ থেইক্যা আইস্যা করাচিতে যাইয়া ভদ্রমহিলার লগে দেখা কইর‍্যা কইলেন বাবার সম্পত্তি কোথায় কী আছে ইউ নো বেটার দ্যান আই ডু। সব আপনের। ভদ্রমহিলারে বাড়িঘর সব দিয়া-থুইয়্যা চইল্যা আইলেন। বাড়িটাও তাঁর অইত না। বউয়ের কারণে অইছে। বউটা রেহমানের চাইতে চালাক-চতুর। আমি অখনও রেহমানের লগে দেখা অইলে ঠাট্টা কইর‍্যা সরস্বতীর বাহন সেই হাঁসের গল্পটা কই। আপনে সেই হাঁসের মতন পানি মিশান দুধের সবটা দুধ খান। আর আপনের বন্ধুর জন্যে থাকে সবটা পানি।

আমি জানতে চাইলাম, বন্ধুটা কে?

স্যার বললেন, আছেন একজন।

কথাবার্তার এই পর্যায়ে স্যার হোসেন জিল্লুরের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, এখন আপনেগো বিআইডিএস-এর ডিরেকটর কে?

জিল্লুর জবাব দিলেন, আবু আবদুল্লাহ্।

স্যার জানতে চাইলেন, এখন আবু আবদুল্লাহ্‌র বয়স কত অইব? জিল্লুর বললেন, বাহান্ন-তিপ্পান্ন।

স্যার মনেমনে কী একটা হিসেব করলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনে মুসারে চিনেন নিহি।

আমি বললাম, আমার ক্লাসফ্রেন্ড।

স্যার বললেন, ভেতরটা একেরে সাদা। কোনো ধরনের জটিলতা নাই। আমার নেক্সট কাজিনের মাইয়ারে বিয়া করছে। সে হিসাবে মুসা আমার রিলেটিভ।

আলোচনার মোড় ঘুরে দীনেশচন্দ্র সেনে এসে ঠেকলো।

স্যার বললেন, দীনেশ সেন ওয়াজ রিয়্যালি এ গ্রেট ম্যান। এদিক সেদিক কিছু ব্যাপার আছে—তার পরেও। তাঁর যখন অসুখ অইছিল, চিকিৎসার জন্য

ডাক্তার বিধান রায়রে ডাকছিলেন। বিধান রায় ফিস দাবি করছিলেন দুই হাজার টাকা। তাঁর পরিবারের তরফ থেইক্যা বিধান রায়রে জানান অইল দুই হাজার টাকা ফিস দিয়্যা চিকিৎসা করানোর সাধ্য তাগো নাই। তারপরে স্যার নীলরতনরে ডাইক্যা আনলেন। নীলরতন দেখলেন। তাঁর কাছে জানতে চাওয়া অইল কত ফিস দিতে অইব। স্যার নীলরতন কইলেন, বাঙালি জাতির ত দীনেশ সেনের কাছে কিছু ঋণ আছে। ফিসের কথা উঠব কেন?

স্যার বললেন, দুইজন মানুষের মধ্যে কমপেয়ার কইর‍্যা দেখেন। আমাদেরকে কোনো কথা বলতে না দিয়ে চিত্তরঞ্জন দাশের প্রসঙ্গে চলে এলেন স্যার। তিনি বললেন, বারিণ ঘোষের মানিকতলা বোমা মামলার সময় চিত্তরঞ্জন দৈনিক ফিস নিতেন দুই হাজার টাকা। কোর্টে যাইবার আগে টাকাটা আগাম দিতে অইত। মিঃ জিন্নাহ্ একমাস ধইর‍্যা তিলকের একটা মামলা করছেন, ফিসের কথা যখন উঠল মিঃ জিন্নাহ্ কইলেন, আই ক্যান নট ক্লেইম ফিস ফ্রম এ পার্সন হু ইজ নট ফাইটিং ফর হিজ ইনডিভিজুয়াল ইন্টেরেস্ট। তারপর মতিলাল নেহরুর কথায় এলেন। স্যার বললেন মতিলাল উর্দু, ফার্সি এসব খুব ভালা জানতেন। কিন্তু জওহরলাল কোনো ইন্ডিয়ান ভাষা জানতেন না। হিন্দিটা তিনি কইতে পারতেন শুধু, পড়তে পারতেন না। আমার সব কথা মনে নেই।

স্যার ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসে চলে এলেন। তিনি বললেন, হিন্দুদের মধ্যে জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস যা এখন আপনেরা দেখবার পান, এইডা প্রাচীন আর্যদের বিশ্বাস আছিল না। আর্যরা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করলে বেদে উল্লেখ থাকত। বেদে এক্কেরে জন্মান্তরবাদের ছিটাফোঁটাও নই। এইডা তারা পরে দ্রেভিডিয়ানদের কাছ থেইক্যা ইনহেরিট করছে।

আমি বললাম, বাংলার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু বলেন।

স্যার বললেন, বাংলার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি আর কী কমু। সে ত আপনেগো উপর। আপনেরা কী করবেন আমি কেমনে কমু! মিঃ জিন্নাহ্ ত বেঙ্গল আপনেদেরে দিয়া দিছিলেন, আপনেগো চিত্তে সুখ অইলো না বেঙ্গল পার্টিশন করলেন। মুহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌র যে বিশেষ উক্তিটির কথা স্যার আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন, উলপার্টের লেখা জিন্নাহ্ অব পাকিস্তান গ্রন্থ থেকে আমি উদ্ধৃত করছি :

"By the end of April, the Muslim league had a clear majority in the Punjab, and the Nawab of Mamdot demanded Governor jenkins call upon him to form a ministry instead of continuing autocratically to rule under section 93 of the 1935 act. Jinnah finally went to Mount Batten to reiterate that demand, but the

viceroy, like his governor, refused to install one party rule in Punjab,. fearing it would incite 'Civil War' as threatend by the Sikhs. During this same interview, the viceroy informed Jinnah of Suhrawardy's recently expressed hope that he might 'be able to keep a united Bengal on condition that it joined neither Pakistan, nor Hindustan. I asked Mr. Jinnah straight out what his views were about Bengal United at the price of remaining its out of Pakistan.

He said without any hesitation, I should be delighted. What is the use of Bengal without Calcutta, they had much better remain united and independent, I am sure they would be on friendly terms with us. I then mentioned that Mr. Suhrawardy had said that if Bengal remained independent and united, they would wish to remain within the Common wealth. Mr. Jinnah replied, of course, just as I indicated to you that Pakistan would wish to remain within the Common wealth."

সেই একই বৈঠকটিতে স্যারের কাছে প্রশ্ন করেছিলাম জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর বলার কিছু আছে কি না। কিছুদিন আগে যখন সাক্ষাৎ করেছিলাম, তিনি জানিয়েছিলেন এই জাতির ভবিষ্যৎ কী চিন্তা করতে পারছেন না। বলেছিলেন, সব থুইয়া আপনেরা দেশের কাম করা উচিত। খবর নিয়ে জানলাম, বদরুদ্দীন উমর সাহেবকেও তিনি একই রকম পরামর্শ দিয়েছেন। আমরা আশা করেছিলাম তিনি আমাদের নতুন কোনো পরামর্শ দেবেন। স্যার সেদিক দিয়ে গেলেন না। সম্পূর্ণ একটা নতুন বিষয়ে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। দেশ মানে ত দেশের মানুষ। মানুষই অইল গিয়া দেশের আসল শক্তি। মানুষগোরে আপনেরা ডেড ওয়েট কইর‍্যা রাইখ্যা থুইছেন। আমাগো দেশের মানুষের একটা দিকে এমন যোগ্যতা আছে ইন্টারন্যাশনালি যে-কোনো দেশের লগে কমপিট করবার পারে। আমি শিপিং-এর কথা কইতাছি। আপনের বাড়ি ত চাটগাঁ। আপনের ত জাননের কথা, আপনের জেলার মানুষ জাহাজের সেরাং ট্যান্ডেল হিসাবে কীরকম এফিসিয়েন্ট। এন্টায়ার ওয়ার্ল্ডে তাদের ডিমান্ড আছে। সিলেট চাটগাঁর মানুষদের হাতে ত আছিল দায়িত্ব। তারা ত কিছু করবার পারে নাই। সিলেট চাটগাঁর মানুষ শিপিংয়ে অ্যাজ গুড অ্যাজ দ্যা সিটিজেন অভ এনি আদার নেশনস। কিন্তু এই লাইনে ত কেউ দৃষ্টি দেয় নাই। আমি পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেইক্যা কইবার পারি। একবার আমারে জাহাজে কইর‍্যা বিলাত থেইক্যা ফিরতে অইছিল। সাড়ে তিন মাস লাগছিল। আমার

টাকার ক্রাইসিস আছিল। হের লাইগ্যা জাহাজে আমার টিকিট কাটছিলাম। ছোট জাহাজ। মোটে সাড়ে সাত হাজার টন। ডিমের খোসার মতন, ঢেউয়ের ঝাপটা যখন লাগে মনে অইত সমুদ্রের তলায় ডুইবা গেলাম। আমার খাওনের একটা প্রবলেম দেখা গেল। আর সব প্যাসেঞ্জার আছিলেন সাদা। আমি অগো লগে খাইবার চাইছিলাম না। আমার লাইগ্যা একটা ভিন্ন ব্যবস্থা করা অইল। খালাসি সারেং সব দেখলাম আমাগো দেশের মানুষ। তারা দাবি করলেন, আপনে আমাগো লগে সপ্তাহে একদিন খাইবেন। আমি তাগো লগে খাইতে আরম্ভ করলাম।

এই আলোচনার পর আচমকা আমি জিগ্‌গেস করে বসলাম, স্যার আপনি তো লন্ডনে হ্যারল্ড লাস্কির ছাত্র ছিলেন।

স্যার বললেন, হ।

তিনি ত ইহুদি ছিলেন। ডিসক্রিমেনেট করতেন?

স্যার মাথা ঝুঁকিয়ে বললেন, এক্কেরে না এক্কেরে না, কোনোদিনও টের পাই নাই। তিনি আমারে একদিন কইলেন মিঃ রাজ্জাক, তুমি চেষ্টা করলে নেহরুর মত অইতে পারবা। দ্বিতীয়বার যখন এই একই কথা কইলেন, আমি চিন্তা করলাম এই মনোভাব আর বাড়তে দেওয়া ঠিক না। আমি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ কইর‍্যা কইলাম, মিঃ লাস্কি। তিনি কইলেন, ইয়েস মাই বয়। আমি কইলাম, আই ডু নট উইশ টু বি ম্যানশনড উইথ মিঃ নেহরু। আই এ্যাম এ মেম্বার অব মুসলিম লীগ অ্যান্ড এ ফলোয়ার অব মিঃ জিন্নাহ্‌। এরপরে আর কিছু কয় নাই। লাস্কি নেহরুর খুব ভক্ত আছিল। একদিন ক্লাসে অনেক ছাত্রের মধ্যে বললেন, নো ম্যান ইজ ইনফলিবল, আমার দিকে তাকাইয়া ছোট কইর‍্যা কইলেন নট ইভেন মিঃ জিন্নাহ্‌? সকলে অবাক অইয়া আমার দিকে তাকাইলেন, আমি কইলাম আই হ্যাভ প্রপার্লি আন্ডারস্টুড। মিঃ লাস্কি কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বার আছিল। কিন্তু মিঃ চার্চিল ম্যান্ডেস্টার গেলে লাস্কিদের বাড়িতে থাকতেন। তিনি লাস্কি পরিবারের ফ্যামিলি ফ্রেন্ড আছিলেন। কেউ কোনোদিন জানবারও পারে নাই।

তরুণ বয়সে মানুষের শরীরের কোনো অংশে চোট লাগলে যৌবনে সেটা অনুভব করা যায় না অনেক সময়। বুড়ো হলেই ব্যথাটা ফিরে আসে। মানুষের বিশ্বাস এবং সংস্কার এগুলো বেশি বয়সে নতুন করে জেগে ওঠে।

তেরো

এবার আমরা তিনজন একসঙ্গে গেলাম। ইতিহাসের শিক্ষক ড. আহমেদ কামাল এবং অর্থনীতিবিদ ড. হোসেন জিল্লুর রহমান। আমি যখন দরোজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম, দেখি স্যার রেহমান সোবহান সাহেবের বেগম সালমা রেহমানের সঙ্গে কথা বলছেন। আমাকে যখন চিনতে পারলেন, জিগ্‌গেস করলেন, লগে আরও কেউ আছে নিহি?

আমি জিল্লুর এবং কামালকে দেখিয়ে বললাম, এই দুজন।

স্যারের কপালে একটা ভাঁজ পড়লো। বুঝতে পারলাম ঈষৎ বিরক্ত হয়েছেন। স্যার বলেই ফেললেন, আমি কিন্তু বাবা বেশি সময় দিতে পারুম না। সিঙ্গাপুর থেইক্যা আমার ভাইজিটা আইবার কথা।

আমরা চলে আসব কি না চিন্তা করছিলাম। স্যার জিগ্‌গেস করলেন, আইজ প্রেসিডেন্টের বক্তৃতাটা পড়ছেন নিহি? কামাল এবং জিল্লুর অজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

আমি বললাম, সাহাবুদ্দিন সাহেব এশিয়াটিক সোসাইটিতে ড. ইব্রাহিমের স্মরণসভায় একটা বক্তৃতা দিয়েছেন।

স্যার বললেন, আমার যাওনের ইচ্ছা আছিল না। ড. আহমদ হোসেন দানির লগে দেখা অইব হের লাইগ্যা গেলাম। ড. দানি আমাগো এই অঞ্চলের ইতিহাস এত জানেন আমি তিন জন্মেও অত জানবার পারুম না।

আমি জিগ্‌গেস করলাম, তিনি কি বাঙালি?

স্যার বললেন, দানি বাঙালি না। তবে খুব এফিসিয়েন্ট স্কলার।

আমি জানতে চাইলাম, মানুষ হিসেবে কেমন?

স্যার বললেন, ওই মন রাখা কথা বলার অভ্যাস আছে।

স্যার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, একটা কোটেশন আপনে লেইখ্যা রাখেন, সুযোগমতো ব্যবহার করবার পারবেন, দেয়ার আর পিরিয়ডস ইন হিস্টোরি হোয়েন ক্রলিং ইজ দ্যা বেস্ট মীনস অব কম্যুনিকেশন। এই হামাগুড়ি দেওনের পাল্লায় ইন্টেলেকচুয়ালেরা সকলের আগে থাকে। এখন বাংলাদেশের সেই অবস্থা। সকলে কইতাছে খুব ডেভলপমেন্ট অইতাছে। কাইল পানি আছিল না, আইজ ইলেকট্রিসিটি নাই, পরশুদিন গাড়িঘোড়া নাই, এইগুলা অইল সিম্পটম অভ ডেভলপমেন্ট, শুইন্যা শুইন্যা কান পইচ্যা গেছে।

বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দিন সাহেবের ইব্রাহিম স্মারক বক্তৃতার কথা কেনো উল্লেখ করলেন, আমার মনে কারণটা ঝিলিক দিয়ে উঠল। নিশ্চয়ই

সাহাবুদ্দিন সাহেব ইব্রাহিমকে বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা–ট্রস্টা এইরকম কিছু বলেছেন। কথাটা স্যারের মনে লেগেছে। আমার ধারণা স্বাধীন বাংলাদেশের কনসেপ্টটা বিকশিত করার পেছনে স্যারের যে ভূমিকা তার সঙ্গে অন্য কারও তুলনা করা যাবে না। স্যারের অবদান সকলে অস্বীকার করছেন, মুখে কিছু না বললেও স্যার অন্তরে আহত হয়েছেন। আমার ধারণা স্যারের বিরক্ত হওয়ার এটাই কারণ।

স্যার সময় বেঁধে দিয়েছেন। আমরা চলে আসার কথা চিন্তা করছিলাম। স্যার টেবিল থেকে একটা বই টেনে নিয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। এইডা কী কইবার পারেন? স্যারই বললেন, রামকৃষ্ণের কথামৃত। কথাবার্তা যেসব কইছেন এক্কেরে খাঁটি। কোনো খাদ আছিল না। মানুষ অ্যাসেস করার একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছিল। বিদ্যাসাগর, দেবেন ঠাকুর, কেশব সেন, বঙ্কিম, গিরিশ ঘোষ সকলের সম্পর্কেই রামকৃষ্ণের বিশেষ বিশেষ মন্তব্য আছে। সেগুলা অনেকটাই সত্যের কাছাকাছি। তিনি ত দেবেন ঠাকুর সম্পর্কে কইছেনই যে–মানুষ চৌদ্দটা পোলা মাইয়া জন্ম দিছেন, হে সাধনা করবার সময় পাইল কখন!

আমরা হা হা করে হাসলাম। স্যার বঙ্কিমে চলে এলেন। বঙ্কিমের একটা ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স আছিল। তার পড়াশোনা অইছিল মুসলমানের টাকায়। মুহসিন ফান্ডের টাকায় তিনি লেখাপড়া করছিলেন। মুসলমানের বিরুদ্ধে কলম ধইর‍্যা সেই ঋণ শোধ করছিলেন। তারপর স্যার বললেন, রামকৃষ্ণ বঙ্কিমরে দেইখ্যা কইছিলেন, তোমার মনে এত অহঙ্কার কেন?

আমি বললাম, বিদ্যাসাগরের সঙ্গেও বঙ্কিমের সাক্ষাতের এরকম একটি গল্প চালু আছে। বিদ্যাসাগর বিএ–তে বাংলার প্রশ্নপত্র তৈরি করেছিলেন এবং প্রশ্নপত্র কঠিন হয়েছিলো, সে কারণে বঙ্কিম কম নম্বর পেয়েছিলেন। তাঁকে গ্রেস মার্কস দিয়ে বিএ পাশ করতে হয়েছিল। একারণেই তিনি বিদ্যাসাগরের ওপর খাপ্পা ছিলেন।

স্যার বললেন, বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে এরকম একটা নালিশ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও করেছিলেন। শাস্ত্রী মশায় বলেছিলেন, বিদ্যাসাগর সংস্কৃতবহুল বাংলা লিখে বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের দুহিতা প্রমাণ করবার চেষ্টা করছিলেন। স্যার বললেন, বঙ্কিমের বাবাও ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি বহরমপুরে ছিলেন এবং এই জেলার সম্পর্কে যা লেখছেন আমি পড়ছি। ইংরেজ আসার পরে এই দেশের রেভিনিউ সিস্টেমের মধ্যে যে চেঞ্জ আইছে সেইটা শুধু বঙ্কিম না, কেউ বুঝবার পারে নাই। সায়েন্টিস্ট নিউটন আছিলেন মিন্ট মাস্টার। সে সময়টা

আওরঙ্গজেবের আমল, ইন্ডিয়ার মানিটারি সিস্টেম যে-কোনো ইউরোপীয় দেশের চাইতে অনেক বেশি সুপিরিয়র আছিল।

স্যার যখন কথা বলতে আরম্ভ করেন, একসঙ্গে অনেক কথাই বলে ফেলেন। শুধু একটা সূত্র প্রয়োজন। আমরা যদি ধরিয়ে না দিই নিজেই সূত্র ঠিক করে নেন।

কথাবার্তা একসময়ে বদরুদ্দীন উমর সাহেবদের পূর্বপুরুষ নওয়াব আবদুল জব্বারে এসে ঠেকলো। আবদুল জব্বার এবং তাঁর এক ভাই, দুইজনেই আছিলেন সদরঅলা। একবার লর্ড ক্যানিং তাগো বাড়িতে বেড়াইতে গেছিলেন। তিনি নওয়াব আবদুল জব্বারেরে কথা প্রসঙ্গে কইছিলেন তোমাদের মধ্যে এক্কেরে কৃতজ্ঞতা নাই। নওয়াব আবদুল জব্বার জবাব দিছিলেন, আমরা অকৃতজ্ঞ বইলাই ত তোমরা আমাগো উপর রাজত্ব করছ।

উমর সাহেবদের পরিবারের প্রসঙ্গ যখন উঠল আমি আবুল হাশিম সাহেবের বাবা মৌলবি আবুল কাশেম সাহেবের কথা তুললাম। বললাম, নানা জায়গায় পড়েছি, আবুল কাশেম সাহেব ফজলুল হক সাহেবকে সব সময়ে দুষ্ট গ্রহের মতো আড়াল করে রাখতেন। উমর সাহেব একসময়ে জানিয়েছিলেন, তাঁর পিতামহের সঙ্গে লর্ড রীডিং-এর গলায়-গলায় ভাব ছিল।

স্যার বললেন, মৌলবি আবুল কাশেম সুবিধার মানুষ আছিল না। তিনি সবসময় সত্য কথা বলতেন, এই কথা তাঁর অতি শত্রুও বলতে পারবে না। কিন্তু ইংরিজিটা বলতেন চমৎকার। তিনি সবসময়ে খুব মিহি ধুতি এবং পাঞ্জাবি পরতেন। আর মাথায় একটা কিস্তি টুপি। ডায়েসে খাড়াইয়া যখন কথা বলতেন, একেকটা ওয়ার্ড মুক্তার দানার মতো ঝইর‍্যা পড়ত।

স্যার যেহেতু আমাদের শুরুতে বলে দিয়েছেন তিনি অধিক সময় দিতে পারবে না, আমরা কেউ কোনো প্রশ্ন করলাম না। অপেক্ষা করছিলাম, তিনি একটা জায়গায় থামবেন, তখন আমরা চলে আসবো। লর্ড রীডিং-এর সূত্র ধরেই তিনি বক্তব্য বলতে থাকলেন। লর্ড রিডিং-এর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র তাঁর একটা বায়োগ্রাফি প্রকাশ করেন। তিনি যতোদিন ইন্ডিয়াতে ছিলেন প্রতি সপ্তাহে তাঁর পুত্রের কাছে একটা কইর‍্যা চিঠি লিখতেন। ভারতের যেসকল ডিগনিটারির লগে তাঁর দেখা অইত, তাগো সম্পর্কে লর্ড রীডিং তাঁর প্রাইমারি ধারণাটা প্রকাশ করতেন। মিঃ গান্ধীর লগে যখন রীডিং-এর লগে দেখা অইছে, লর্ড রীডিং তাঁর সম্পর্কে লিখছেন, এই লোকের সঙ্গে আমাগো ব্যবসা জমবে ভালা। এইভাবে যত ইন্ডিয়ান লিডারের লগে দেখা অইছে সকলকে একটা ক্যাটিগরিতে ফেলছেন কিন্তু মিঃ জিন্নাহ্‌র সঙ্গে তাঁর দেখা হওনের পরের চিঠিতে এক্কেরে সুর

পান্টাইয়া গেল। এই লোক এক্কেরে বেয়ারা। উই উইল হ্যাভ ট্রাবল ইন হ্যান্ডলিং মিঃ জিন্নাহ্।

আমি বললাম, আপনি সবসময় মিঃ জিন্নাহ্‌কে বেশি বেশি নাম্বার দিচ্ছেন। জিন্নাহ্ সাহেব ওবস্টিনেট ছিলেন সত্য, কিন্তু আপনি তাঁর প্রতি দুর্বল।

স্যার হাসলেন, আমি ত আর বানাইয়া বলবার লাগছি না।

স্যার এই পর্যায়ে শারীরিক দুর্বলতার কথা বললেন। তারপর বললেন, এই শরীর নিয়া গোপালগঞ্জ যাইতে অইব। সকলে আমারে ধইর‍্যা বইল কাজী মোতাহার হোসেন দাবা টুর্নামেন্টে আমার থাকন লাগব। আমি মত দিছিলাম। এখন কইতাছে হেই টুর্নামেন্ট অইব গোপালগঞ্জে। লোকে মনে করে কাজী সাহেবের লগে আমার পরিচয় দাবার মাধ্যমে। আসলে পরিচয় অইছিল নজরুল ইসলামের গানের অনুষ্ঠানে। তখন আমি ক্লাস নাইনের ছাত্র। থাকি গেণ্ডারিয়ায়। কলিকাতার থেইক্যা ঢাকা মেইল আইতে একটু দেরি অইছিল। সকলে নজরুলরে মুসলিম সাহিত্য সমাজের অফিসে নিয়া তুললেন। নজরুল কইলেন উমর ফারুকের উপর কবিতা পড়ার কথা আছিল। লিখতে পারি নাই, অন্য কবিতা পড়ব। সাহিত্য সমাজের অফিস আছিল এখনকার মেডিকেল কলেজের দক্ষিণ গেটের দোতালায়। কথাবার্তা যা নজরুল একাই কইলেন। গান গাইতাছেন, নাইলে কবিতা পড়তাছেন। একটু ক্লান্ত অইলে অন্য একজনরে হারমোনিয়ামের সামনে বসাইয়া দিয়া কইছেন, দেখি তুমি একটু গান কর। তারপর নিজে হারমোনিয়াম টাইন্যা লইয়া গানে মশগুল অইয়া যাইতাছেন। হেই সময় কাজী সাহেবের দাড়ি আছিল না। কাজী সাহেব কইছিলেন, আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে, মডার্ন এডুকেশনস আর কিছু না লাউয়ের মাচার মতো জিনিস। মাচা না থাকলে লাউগাছ ত বাড়তে পারে না। নজরুল ইসলাম শুইন্যাই বললেন, তোমার কথা ঠিক কাজী, তবে লাউ গাছের চাইতে মাচার ওজন বেশি।

আমি বললাম, স্যার, তখন আপনার বয়স কত? স্যার বললেন, কত আর আইব। আমি হবায় ক্লাস নাইনের ছাত্র। অর্ধেক রাত নজরুলের গান, আবৃত্তি কথাবার্তা শুইন্যা কাটাইয়া দিলাম। সেই রাইতে আর বাসায় যাওন অয় নাই। চকবাজারে এক আত্মীয়ের লগে কাটাইলাম।

আমি বললাম, আপনার সঙ্গে নজরুল ইসলামের কোনো কথাবার্তা হয়েছে?

না না, স্যার দুবার মাথা নাড়লেন। আমি ক্লাস নাইনের ছাত্র। জিগ্‌গেস করলাম, এটা ঘটেছিলো কোন সালে।

স্যার একটু থেমে বললেন, উনিশশো সাতাশ সালে।

দীর্ঘদিনের মেলামেশায় এটা আমার জানা হয়ে গিয়েছিলো স্যারকে তাঁর মর্জিমাফিক চলতে দেয়া ভালো। মেজাজ শরিফ একটা ব্যাপার আছে না, এটা স্যারের বেলায় অত্যন্ত সত্য। জানান দিয়ে ঘটা করে প্রশ্ন করতে বসলে স্যারের মুখ থেকে কিছু বের করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। অনেক আগেই আমাদের চলে আসার কথা। কিন্তু স্যারের কথার মাঝখানে চলে আসতে সঙ্কোচ বোধ করছিলাম। সুযোগ যখন তিনি নিজেই করে দিয়েছেন, আমি তাঁর কাছে আবার মিঃ হ্যারল্ড লাস্কি সম্পর্কে প্রশ্ন জিগ্‌গেস করতে আরম্ভ করলাম। আমি বললাম, স্যার, আপনি সর্বমোট কতদিন মিঃ লাস্কির সঙ্গে ছিলেন।

স্যার বললেন, আমি ত সরাসরি পিএইচডি–তে ভরতি অইছিলাম। সর্বমোট সাড়ে পাঁচ বছর মিঃ লাস্কির সাহচর্য পাইছি।

তিনি মিঃ লাস্কি সম্পর্কে নানা রকম গল্প করলেন। এগুলো তিনি আগেও একাধিকবার বলেছেন। এবার আমি অধিকতর সুনির্দিষ্ট হতে চাইছিলাম। আমি বললাম, স্যার, মিঃ লাস্কির ছাত্র হিসেবে তাঁর কোন বৈশিষ্ট্যটি আপনি প্রণিধানযোগ্য মনে করেন?

স্যার এক মিনিটের মতো নীরব থাকলেন। তারপর বললেন, আমি মনে করি মিঃ লাস্কি অন্য মানুষদের এমন সব বিষয়ে চিন্তা করতে প্ররোচিত করবার পারতেন, নর্মালি যেটা তারা করতে অভ্যস্ত নন। এটাই মিঃ লাস্কির সবচাইতে বড় গুণ। স্কলার হিসাবে মিঃ লাস্কি অত উচ্চশ্রেণীর না অইলেও অপরের চিন্তাভাবনায় ধাক্কা দেওন খুব কম কথা নয়।

আমি প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করলাম, গ্রামার অব পলিটিক্সের একটি এডিশনে মিসেস লাস্কি একটি প্রিফেস লিখেছেন।

স্যার বললেন, মিসেস লাস্কি মিঃ লাস্কির চাইতে বয়সে একটু বড় আছিলেন। উঁচা লম্বাও আছিলেন। মিঃ লাস্কি ছিলেন আমার চাইতে একটু উঁচা। কেতাদুরস্ত পোশাক পরতেন। সবসময় সত্য কথা বোধহয় বলতেন না।

আমরা আলোচনার এই পর্যায়ে এসে দেখলাম, স্যারের হাতে সময় নেই, একথাটি সত্যি নয়। অন্যদিনের চাইতেও তিনি বেশি কথাবার্তা বলছেন। সুযোগ যখন পাওয়া গেল, আমরা পুরো সদ্ব্যবহার করতে চাইলাম। আমি বললাম, আদার দ্যান মিঃ লাস্কি হু আর দি স্কলারস ইউ হ্যাভ বিন ইমপ্রেসড?

স্যার হারভার্ডের ম্যাসনের নাম বললেন। গলব্রেথ প্রমুখ পণ্ডিত ব্যক্তির নাম উল্লেখ করলেন। আমি জিগ্‌গেস করলাম, হারভার্ডে মিঃ ম্যাসনের কী পজিসন প্রেস্টিজ আছিল?

স্যার বললেন, মিঃ ম্যাসন ওয়াজ মাস রেসপেক্টেড পারসন ইন হারভার্ড অ্যান্ড ওয়াজ এ গ্রেট স্কলার। আসলে নামেমাত্র একজন প্রেসিডেন্ট আছিল। মিঃ ম্যাসনই গুরুত্বপূর্ণ ডিসিশনগুলো নিতেন। তাঁর লগে এই দেশেই আমার পরিচয় হইছিল। ড. সাদেকের লগে তাঁর একটা মিসআন্ডারস্টেডিং অইছিল, আমি তাতে এরকমের মেডিয়েট করছিলাম, কইছিলাম, হোয়াই ডোন্ট ইউ ইনভাইট হিম ইন এ ডিনার অ্যান্ড ডিসকাস দ্যা ইস্যু। রেভিনিউ প্রশ্নে আমার একটা মন্তব্য ম্যাসন সাহেবের খুব মনে ধরছে। আমি কইছিলাম ল্যান্ডের রেভিনিউ যা ছিল আগে সরকারের আয়ের প্রধান উৎস এখন সে রেভিনিউ দিয়া সরকার পাঁচ পার্সেন্ট অর্থও আয় করবার পারে না। মিঃ ম্যাসন ওয়াজ মাচ ইম্প্রেসড।

ড. আহমেদ কামাল জিগ্‌গেস করলেন, হেনরী কিসিঙ্গার তখন হারভার্ডে ছিলেন না?

স্যার বললেন, অবশ্যই ছিলেন। হি ওয়াজ দেন অ্যান অ্যাসিসটেন্ট প্রফেসর।

আমি বললাম, মিঃ কিসিঞ্জারের সঙ্গে আপনার কোনো পরিচয় ছিলো না?

স্যার বললেন, খুব ভালা পরিচয় আছিল। কাজে কর্মে খুব সুবিধার আছিলেন না কিসিঙ্গার। তবে আমার লগে সম্পর্কটা আছিল খুব ভালা। আমারে তিনি কইছিলেন তাঁর সেমিনারে আমাগো এই অঞ্চল থেইক্যা কিছু ছাত্র পাঠাইবার কথা। পশ্চিমারা এই অঞ্চলের (ইস্ট পাকিস্তান) কাউরে এনকারেজ করে না। হের লাইগ্যা কিসিঙ্গার সাব আমারে কইছিলেন আমি যাতে নামগুলা আগে পাঠাইয়া দেই। আমি মৃদু প্রতিবাদ করে বললাম, হেনরি কিসিঞ্জারের ইউ এস ফরেন পলিসি অ্যান্ড দ্যা নিউক্লিয়ার স্টক পাইলস বইটি আমি পড়েছি। পরে হোয়াইট হাউস ইয়ার্স পড়েছি। অ্যাকটিভ পলিটিশিয়ানদের মধ্যে ঐরকম কমপ্রিহেনশন এবং রেঞ্জসম্পন্ন কোনো মানুষের কথা আমি চিন্তাও করতে পারি না। স্যার বললেন, কিসিঙ্গার সাহেবের লেখাপড়া ত আছিল অসাধারণ। চিন্তা করার শক্তিও আছিল, কিন্তু মানুষটা কাজেকর্মে সুবিধার আছিল না। হারভার্ডে কেউ পাত্তা দিত না।

আমি প্রসঙ্গটা একটু ঘুরিয়ে নিলাম। বললাম, স্যার, শেখ সাহেব কিসিঞ্জারকে বাংলাদেশে নিমন্ত্রণ করে এনেছিলেন। আমাদের এখানে একটা গল্প চালু আছে যে কিসিঞ্জার সাব মোট পঁয়তাল্লিশ মিনিট হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে কাটিয়েছিলেন। তার মধ্যে পঁচিশ মিনিট আপনার সঙ্গে ব্যয় করেছিলেন। এ নিয়ে তৎকালীন ক্ষমতাসীনদের অনেকে রুষ্ট হয়েছিলেন বলে শুনেছি। ঘটনাটা কতটুকু সত্য?

রাজ্জাক স্যার মিঃ কিসিঞ্জারকে উচ্চারণ করতেন কিসিঙ্গার। তিনি জবাবটা এভাবে দিলেন, আমি ত কিসিঙ্গারের লগে দেখা করবার গেছিলাম। অনেক লোক। কিসিঙ্গারের আগের বউটারে আমি চিনতাম। লম্বা নতুন বউটারে চিনবার পারছিলাম না। কামাল হোসেন আরও কে কে আছিল মনে পড়ে না। সকলের লগে তার বউরে পরিচয় করাইয়া দিয়া বলছিলেন, মাই স্টুডেন্টস। স্যার বললেন, আমার ত কাপড়চোপড় অত আছিল না। এই পাজামা পাঞ্জাবি চাদর আর মুখে দাড়ি। কিসিঙ্গারের বউ জিগাইলেন, অলসো ওয়াজ হি ইউর স্টুডেন্ট? কিসিঙ্গার কইলেন, নো নো, হি ওয়াজ মাই কলিগ। এইডাই অইল আসল ঘটনা।

চোদ্দ

বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার সমর সেনের সঙ্গে রাজ্জাক স্যারের একরকম হৃদ্যতা ছিলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকার সময়ে। সমরবাবু হয়তো স্যারের ছাত্র কিংবা ছাত্রস্থানীয় ছিলেন। বোধ করি সমর সেন বাংলাদেশে নিয়োগপ্রাপ্ত দুনম্বর ভারতীয় হাই কমিশনার। সুবিমল দত্তের পরে সমরবাবু ঢাকায় পোস্টিং পেয়েছিলেন। সমরবাবুর বাড়িতে স্যারের পরিবারের যেমন যাওয়া-আসা ছিলো, তেমনি ভারতীয় হাই কমিশনারও নানা উপলক্ষে স্যারের বাড়িতে আসতেন। সেদিন ন'টা সাড়ে ন'টার সময় স্যারের বাড়িতে গিয়ে দেখি সরগরম অবস্থা। কাজের লোকেরা ঘরবাড়ি, আলমারি, চেয়ার, টেবিল, বইয়ের শেলফ ঘষে ঘষে পরিষ্কার করছে। বাড়ির মেয়েরাও ওই পরিচ্ছন্নতা অভিযানে যোগ দিয়েছে। স্যারের ভ্রাতুষ্পুত্রীকে জিগ্‌গেস করলাম, খুব তো তোড়জোড় চলছে, উপলক্ষটা কী?

সে আমাকে জানালো, আজ ভারতীয় হাইকমিশনার এবং তাঁর বেগম দুপুরে খেতে আসবেন।

স্যার কোথায় জিগ্‌গেস করলে সে আমাকে রান্নাঘর দেখিয়ে দিলো।

আমি রান্নাঘরের সামনে এসে দেখি স্যার হেলু চাচিকে নির্দেশ দিচ্ছেন। হেলু চাচি কাজের লোকদের পাল্টা নির্দেশ দিচ্ছেন। খুব ব্যস্ত-ব্যস্ত ভাব।

চুলাতে কড়াই উঠছে এবং চুলা থেকে কড়াই নামছে। ছ্যাঁত ছোঁত শব্দ হচ্ছে। রান্নাঘরের গরমে স্যার ঘেমে গেছেন। তাঁর মুখে বড় বড় ঘামের ফোঁটা। আমাকে দেখে স্যার হাসলেন এবং জিগ্‌গেস করলেন, মৌলবি আহমদ ছফা, রান্নাবান্না করতে জানেন?

আমি মাথা নেড়ে জানালাম, কিছুই জানি না।

স্যার মন্তব্য করলেন, তা অইলে আপনে কোনো কামে আইবেন না। যান বয়েন।

হেলু চাচি বললেন, মেজোভাই, আপনিও একটু বিশ্রাম করেন গিয়ে, বাকিটা আমরা সারতে পারবো।

স্যারের সঙ্গে আমি ড্রয়িংরুমে চলে এলাম। স্যার বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে এলেন। ছোকরা চাকরটা তামাক দিয়ে গেল। স্যার হুঁকোতে টান দিয়ে জিগ্‌গেস করলেন, মৌলবি আহমদ ছফা, আপনে রান্নাবান্নার কোনো খবরটবর রাখেন?

আমি বললাম, না স্যার, কোনো খবর রাখিনে। স্যার বললেন, যে জাতি যত সিভিলাইজড তার রান্নাবান্নাও তত বেশি সফিস্টিকেটেড। আমাগো ইস্টার্ন রান্নার সঙ্গে পশ্চিমাদের রান্নার কোনো তুলনাই অয় না। অরা সভ্য অইছে কয়দিন। এই সেদিনও তারা মাছ মাংস কাঁচা খাইত।

স্যার গ্যাস্ট্রোনমির ওপর একটা সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিলেন। তার অনেক কিছুই আমার মনে নেই। মুসলমানেরা যেসব খাওয়াদাওয়া ভারতে চালু করেছে ভাসাভাসা তার দুয়েকটা মনে আছে। চীনা খাবার, ভারতীয় খাবার, আরবদের এবং ইউরোপীয়দের খাবারের বৈশিষ্ট্য নিয়ে সেদিন আলোচনা করেছিলেন এবং প্রাকৃতিক কারণও ব্যাখ্যা করেছিলেন। রান্নাবান্না এবং খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে আমার কোনো আগ্রহ না থাকায় স্যারের আলোচনা আমার মনে স্থান করে নিতে পারেনি।

টেলিফোনে কার সঙ্গে কথা বললেন। রিসিভার রেখে বললেন, বদরুদ্দীন উমর। হেরেও আইবার কইছিলাম। হে কয় তার অন্য কাম আছে। তারপরে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনে কোনোদিন বদরুদ্দীন উমরের বউয়ের বাংলা উচ্চারণ শুনছেন নিহি?

আমি বললাম, না, আমি শুনিনি।

এক্কেরে বিশুদ্ধ বাংলা কয়, উচ্চারণ নিখুঁত। আপনেগো উচিত তার বাংলা পাঠ ক্যাসেট কইরা রাখা। পরে খুব কামে আইব।

আমি বললাম, আপনি ত স্যার ঢাকার বাংলা বলেন, আমাদেরকে কেনো পশ্চিম বাংলার উচ্চারণরীতিটা অনুসরণ করতে বলছেন?

স্যার কথাটা পাশ কাটিয়ে গেলেন। তারপর তিনি একজন সাহেবের নাম উচ্চারণ করলেন, আমি এখন মনে করতে পারছি না। সেই সাহেব নাকি একশো বছর আগে লিখে গিয়েছেন, বেঙ্গলে ঢাকা জেলার মানুষেরা বিশুদ্ধ বাংলায় কথাবার্তা কয়। এই ফাঁকে স্যার আরেকবার তামাক দিতে বললেন। হুঁকো টানতে টানতে বললেন, বাংলা ভাষার মধ্যে যে পরিমাণ এলিট (elite) মাস (mass) গ্যাপ এইরকম দুনিয়ার অন্য কোনো ভাষার মধ্যে খুঁইজ্যা পাইবেন কি না সন্দেহ। আধুনিক বাংলা ভাষাটা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতেরা সংস্কৃত অভিধান দেইখ্যা দেইখ্যা বানাইছে। আসল বাংলা ভাষা এইরকম আছিল না। আরবি ফারসি ভাষার শব্দ বাংলা ভাষার লগে মিশ্যা ভাষার একটা স্ট্রাকচার খাড়া অইছিল। পলাশির যুদ্ধের সময়ের কবি ভারতচন্দ্রের রচনায় তার অনেক নমুনা পাওয়া যাইব। ব্রিটিশ শাসন চালু অইবার পরে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতেরা আরবি ফারসি শব্দ ঝাঁটাইয়া বিদায় কইর্যা হেই জায়গায় সংস্কৃত শব্দ ভইর্যা থুইছে। বাংলা ভাষার চেহারা কেমন আছিল, পুরানা দলিলপত্র খুঁইজ্যা দেখলে কিছু প্রমাণ পাইবেন।

আমি বললাম, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতেরা যে গদ্যরীতিটা চালু করেছিলেন, সেটা তো স্থায়ী হতে পারেনি। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এসে বাংলা গদ্যের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন এবং রূপান্তর ঘটে গেছে।

পরিবর্তন ত অইছে। কিন্তু কীভাবে অইছে এইটা দেখন দরকার।

আমি জানতে চাইলাম, কীভাবে পরিবর্তনটা হয়েছে। স্যার বললেন, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতেরা ভাষার স্ট্রাকচারটা খাড়া করেছিলেন, তার লগে ভাগীরথী পাড়ের ভাষার মিশ্রণে আধুনিক বাংলা ভাষাটা জন্মাইছে। আধুনিক বাংলা বঙ্গসন্তানের ঠিক মুখের ভাষা না, লেখাপড়া শিইখ্যা লায়েক অইলে তখনই ওই ভাষাটা তার মুখে আসে।

স্যার অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা বলছিলেন। নিচে গাড়ির হর্ন শোনা গেল। তিনি তড়িঘড়ি উঠে দাঁড়ালেন। আমাগো মেহমানরা বুঝি আইলেন।

আমি বললাম, স্যার আমি এখন যাই।

স্যার বললেন, যাইবেন কই বয়েন, আপনেও একলগে চাইরটা খাইয়া যাইবেন।

আমি গায়ের ময়লা কাপড়চোপড় দেখিয়ে বললাম, এই জামাকাপড়ে ভারতীয় হাইকমিশনারের সামনে যাওয়া ঠিক হবে না।

স্যার বললেন, মৌলবি আহমদ ছফা, আপনের মুখে এই প্রথম শুনলাম, আপনেও জামাকাপড়ের কথা চিন্তা করেন।

আমি চলে এলাম, স্যার আর পীড়াপীড়ি করলেন না।

কিছুদিন পরে স্যারের বাড়িতে গেলাম। স্যার একা ছিলেন। তাঁকে খুব খুশি-খুশি মনে হচ্ছিলো। কয়েকদিন থেকে একটা ব্যাপার নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে জবর বিতর্ক চলছিলো। বিষয়টি ছিল সেক্যুলারিজম। সেক্যুলারিজমের বাংলা প্রতিশব্দ কেউ-কেউ ইহজাগতিকতা বলে দাঁড় করাতে চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু এই প্রতিশব্দের মধ্যে সেক্যুলারিজমের আসল স্বরূপ প্রকাশ পায়নি বলেই আমার ধারণা। তাই স্যারকে জিগ্‌গেস করলাম। সেক্যুলারিজম কী? স্যার বললেন, ইউরোপীয় রেনেসাঁর আগে খ্রীস্টানজগৎ মনে করত মরণের পরে যে অনন্ত জীবন অপেক্ষা কইর‍্যা আছে হেইডা অইল আসল জীবন। দুনিয়ার জীবন তার অ্যাপেনডেজ মাত্র। খ্রীস্টানগো শিল্প সাহিত্য সবখানেই পরকালের মহিমাকীর্তন করা অইত। যীশুখ্রীস্ট ত এই নশ্বর দুনিয়াকে ভেল অভ টিয়ার্স কইয়া গেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গিটা একদিনে একমাসে বা এক বছরে পাল্টায় নাই, অনেকদিন লাগছে। রেনেসাঁর সময়ে যখন ধীরে ধীরে জীবনের একটা ডেফিনেশন তৈয়ার অইতেছিল, তখন পুরা দৃষ্টিভঙ্গিটাই পাল্টাইয়া গেল। রেনেসাঁর আগে পরকালটাই আছিল সব। রেনেসাঁর পরে এই দুনিয়াটাই সব, পরকাল কিছুই না।

আমি বললাম, সব ধর্মেই তো অনন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। ইসলাম ধর্মেও পরকালের ভূমিকাকে বড় করে দেখানো হয়েছে।

স্যার বললেন, ইসলাম ধর্মের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মের একটা বড় পার্থক্য এইখানে যে ইসলাম ধর্মেও পরকালের গুরুত্ব স্বীকার করা অইছে, কিন্তু ইহকালের গুরুত্বও অস্বীকার করা অয় নাই। ফিদ্দুনিয়া ওয়াল আখেরাতের কথা ইসলামে যেভাবে বলা অইছে, অন্য কোনো ধর্মে সেরকম নাই। তিনি বললেন, ইন্ডিয়ার কথাই ধরেন না কেন, এইখানে যত কাব্য লেখা অইছে, যত স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যকীর্তি তৈয়ার অইছে, তার লক্ষ্য আছিল দেবতার সন্তোষসাধন। মানুষের ভোগ, উপভোগ, আনন্দের কথা প্রসঙ্গক্রমে বলা অইলেও মূল গতিমুখ আছিল দেবতাদের সন্তুষ্ট করা। এই জিনিসটা বাংলা সাহিত্যেও দেখতে পাইবেন। ভারতচন্দ্র এইটিনথ সেঞ্চুরিতে অন্নদামঙ্গল কাব্য দেবীর আদেশে, দেবীর পূজা প্রচলন করার উদ্দেশ্যে লিখতে বইছেন। মুসলমানেরা এই দেশে আইস্যা মসজিদ এবং অন্যান্য ধর্মস্থান সুন্দর কইর‍্যা বানাইছে, এই কথা যেমন সত্য, তেমন বাস করবার ঘরটারেও সুন্দর কইর‍্যা বানাইতে ভুল করেন নাই। এই জিনিস আপনে এ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়াতে পাইবেন না। সেক্যুলারাইজেশন ইফেক্ট অব ইসলাম অন ইন্ডিয়া ওয়াজ রিয়্যালি ইনারমাস। এই কথা এখন অনেকে মাইন্যা নিবার চান না।

আমি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ওপর নাতিক্ষুদ্র একটি পুস্তিকা লিখেছিলাম। ওতে কিছু নতুন কথা সাহস করে বলেছিলাম। লেখাটির বক্তব্য নিয়ে ঢাকা এবং কলকাতার পণ্ডিতদের মধ্যে উত্তপ্ত বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। অনেকে আমার সঙ্গে একমত হয়েছিলেন। অপরদিকে আমার মতের বিরোধিতা যাঁরা করছিলেন, তাঁদের সংখ্যাও অল্প ছিল না। আমার ইচ্ছে ছিল রাজ্জাক স্যার আমার লেখাটি সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করেন একসময়ে গিয়ে জেনে নেবো। নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। স্যারও থাকেন অনেক দূরে। কখন বাসায় থাকেন তারও ঠিক নেই। নানা মানুষ তাঁকে ধরে নানা জায়গায় নিয়ে যান। যাহোক, এক সন্ধ্যায় স্যারের বাড়িতে গেলাম। তিনি সিঙ্গাপুর থেকে কয়েকদিন হল চিকিৎসা সেরে এসেছেন। আমাকে দেখামাত্রই স্যার টেবিল থেকে বঙ্কিমের ওপর আমার লেখা বইটি হাতে তুলে নিয়ে বললেন, এই যে আপনের লেখা।

আমি একটুখানি বিস্মিত হয়ে বললাম, স্যার, আমি তো আপনাকে বইটা দিতেই এসেছি, আপনি কীভাবে পেলেন।

স্যার বললেন, আপনে দেওনের আগে পাইছি।

আমি জানতে চাইলাম, স্যার লেখাটি পড়েছেন।

আমি অপেক্ষা করছিলাম তাঁর মতামত জানার জন্য। স্যার এভাবে কথা শুরু করলেন, একটা কবিতা আছে না— 'আমি থাকি ছোট ঘরে বড় মন লয়ে, নিজের দুঃখের অন্ন খাই সুখী হয়ে।'

বঙ্কিমের ব্যাপারে জিনিসটা অইব একেবারে উল্টা অর্থাৎ আমি থাকি বড় ঘরে ছোট মন লয়ে। হের উপরে আপনের সময় নষ্ট করার প্রয়োজন আছিল না। আপনের ত অঢেল ক্ষমতা, অপাত্রে নষ্ট করেন ক্যান? ইচ্ছা করলে অন্য কাম করবার পারেন।

একজন লেখক হিসেবে বঙ্কিমের চাপিয়ে দেয়া ধারণার প্রতিবাদ করার প্রয়োজনীয়তা আমি অনুভব করেছি, একথা স্যারকে বারবার করে বুঝিয়ে বলেও সন্তুষ্ট করতে পারলাম না।

কয়েক বছর থেকে একটা জিনিস আমি লক্ষ করে আসছি। আমার কোনো লেখা যদি স্যারের মনঃপুত না হয়, স্যার সেই রচনা সম্পর্কে কোনো মন্তব্যই করেন না। শেলফ থেকে টলস্টয়ের ওয়র অ্যান্ড পীস নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করেন। এই উপন্যাসে যুদ্ধের দৃশ্য কত নিপুণভাবে বর্ণিত হয়েছে, মানব-চরিত্রের গভীরে ডুব দিয়ে টলস্টয় কত বিশদভাবে ছোটো বড় চরিত্র বিকশিত করে তুলেছেন, নিসর্গদৃশ্য, নরনারীর প্রেম এসব টলস্টয় যতো মুন্সিয়ানা সহকারে এঁকেছেন, জগতের কোনো লেখকের সঙ্গে তার তুলনা চলে

না। অনেকবার কথাবার্তার মাঝখানে উঠে গিয়ে ওয়র অ্যান্ড পীস উপন্যাসটি টেনে নানাদিক সম্পর্কে কথাবার্তা বলেছেন। বছরখানেক আগে একবার বলেছিলেন, টলস্টয়কে যদি সামন্তসমাজের ক্রিটিক হিসেবে ধরা হয়, তা হলে সলঝেনিতসিনকে বলতে হবে কমিউনিস্ট সমাজের ক্রিটিক। বঙ্কিমের ওপর কথা বলতে গিয়ে আজও স্যার টলস্টয়ের ওয়র অ্যান্ড পীসের ওপর এন্তার কথাবার্তা বললেন।

সেদিন ঘরে ফেরার সময় আমার মনে আচমকা একটা নতুন চিন্তা এল। স্যার দীর্ঘদিন ধরে আমাকে টলস্টয়ের ওয়র অ্যান্ড পীস উপন্যাস সম্পর্কে এত আগ্রহী করার চেষ্টা করছেন কেনো? আমি নিজেকেই প্রশ্ন করলাম তার পেছনে স্যারের কি কোনো উদ্দেশ্য আছে? তখনই মনের ভেতর থেকে জবাব পেলাম। স্যার বোধ করি চান যে আমি ওয়র অ্যান্ড পীসের মতো কোনো বড় কাজ করার চেষ্টা করি না কেনো? এইরকম একটি বড় উপন্যাস রচনা করার দম আমার আছে কি না জানি না। আমার ধারণা সঠিক কি না পরখ করার জন্য একদিন স্যারের কাছেই সরাসরি প্রশ্ন করে বসলাম, স্যার, আপনি কি চান ওয়র অ্যান্ড পীসের মতো একটি বড় উপন্যাস লেখার কাজে আমিও হাত দিই? স্যার সোজাসুজি আমার দিকে ভালো করে তাকালেন। হ, এতদিনে বুঝবার পারছেন?

রাজ্জাক স্যার আমার সঙ্গে কখনো আমার রচনার ভালোমন্দ কোনোকিছু আলোচনা করেননি। অন্যের মুখে শুনেছি, আমার লেখা তিনি পছন্দ করেন। তারিফ শুনতে কার না ইচ্ছে হয়! আমি একাধিকবার জানতে চেয়েছি, স্যার আমার লেখা আপনার কেমন লাগে, স্যার জবাব দিয়েছেন, না বাবা, আপনেগো লেখার ভালোমন্দ এখনও কইবার পারুম না। লেখার ক্ষমতা আছে লেইখ্যা যান। নিজের খুশিতে লেখবেন। অন্য মাইনষে কী কইব হেইদিকে তাকাইয়া কিছু লেখবেন না।

স্যারের ওধরনের জবাব শোনার পর তাঁর মতামত জানার সাহস হয়নি। আমি কিন্তু স্যারকে হুমায়ূন আহমেদের প্রথম দিককার রচনার তারিফ করতে শুনেছি। একাধিকবার তিনি আমার কাছে বলেছেন, হুমায়ূনের লেখার হাতটি ভারি মিষ্টি। পরবর্তীতে হুমায়ূন–প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেও উচ্চবাচ্য কিছু করতেন না।

জার্মান কবি গ্যোতের অমর কাব্য ফাউস্টের অনুবাদে আমি মন দিয়েছিলাম সেই সময়ে। তার একটা অংশ মাসিক সমকালে প্রকাশিত হয়েছিল। সেই অংশটুকু স্যারকে দেখিয়েছিলাম। স্যার একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন।

আমার অনুবাদটির কথা কত মানুষকে যে বলেছিলেন, তার হিসেব নেই। যে ধরনের কাজে অমানুষিক মানসিক শ্রমের প্রয়োজন হয়, সে ধরনের কাজ করার প্রেরণা আমাদের সমাজ থেকে সংগ্রহ করা একরকম অসম্ভব। এখানে একজন বড় কাজ করলে উৎসাহ দেয়ার জন্য কেউ এগিয়ে আসে না। আমাদের সমাজে গুণগ্রাহিতার পরিমাণ নিতান্তই সঙ্কুচিত। সুরুচিসম্পন্ন সংস্কৃতিবান অধিক মানুষ আমাদের সমাজে সত্যি সত্যি বিরল। অবশ্য সাম্প্রতিককালে অবস্থাটা কিছু–কিছু পাল্টাতে আরম্ভ করেছে। রাজ্জাক স্যার যদি আমাকে অনুবাদকর্মটা শেষ করার জন্য বারবার তাগাদা না দিতেন, হয়তো আমি এরকম একটি শ্রমসাধ্য কর্মে দীর্ঘকাল চেষ্টা প্রযত্ন এবং শ্রম ব্যয় করতে পারতাম না। একা রাজ্জাক স্যার অনুপ্রাণিত করেছিলেন, একথা বলাও সঠিক হবে না। আরও অনেকেই উৎসাহিত করেছিলেন। রাজ্জাক স্যারের সঙ্গে অন্য কারও তুলনা চলতে পারে না। কাজটি যখন শেষ করে আসছিলাম, সে সময়ে আমার হাতে বিশেষ টাকাপয়সা ছিলো না। তিনি সময়ে অসময়ে টাকাপয়সা দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। তিনি আমার রচনাটির যেভাবে প্রশংসা করছিলেন, চাইতেন অন্যেরাও সেভাবে অনুবাদটিকে গ্রহণ করুন। সাহিত্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ তাঁর বাড়িতে হামেশা যাওয়া–আসা করতেন। আমি উপস্থিত থাকলে আমাকে ফাউস্টের অনুবাদ পাঠ করে শোনাতে নির্দেশ দিতেন। এই ভদ্র লোকদের কেউ–কেউ মেপে মেপে প্রশংসাও করতেন। বলতেন বেশ হচ্ছে, শুনতে একটুও খারাপ শোনাচ্ছে না ইত্যাদি ইত্যাদি। দুয়েকবার এভাবে রচনা পাঠ করার পর আমার বুঝতে বাকি রইলো না এই ভদ্রলোকেরা আমার রচনার প্রশংসা করেন, একারণে নয় যে আমার রচনাটি তাঁদের কাছে সত্যি সত্যি ভালো লেগেছে, স্যারকে খুশি করার জন্যই তাঁরা প্রশংসার কথাগুলো বলতেন। তার পর থেকে স্যার কাউকে রচনা থেকে পড়ে শোনাতে বললে আমি ভয়ানক বিরক্ত হতাম, মনেমনে চটে যেতাম। নানারকম অছিলা করে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করতাম।

একদিন সন্ধেবেলা স্যার আমাকে বললেন, আপনে আমার ওইখানে কাইল বেয়ানবেলা একবার আইবেন। নাস্তা আমার এইখানেই খাইবেন।

পরের দিন সকালবেলা আমি গিয়ে দেখি অনেক হোমরাচোমরা ব্যক্তি হাজির হয়েছেন। সৈয়দ আলি আহসান, মোস্তাফা নূরউল ইসলাম, ড. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, সরদার ফজলুল করিম—আরও কে কে ছিলেন নাম মনে পড়ছে না। স্যার আমাকে অর্থনীতিবিদ ড. মুশাররফ হোসেনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে জানালেন, মৌলবি আহমদ ছফা ফাউস্ট অনুবাদ করছে এবং অনুবাদ খুব ভালো হচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি। ড. মুশাররফ বড় বড় চোখ পাকিয়ে এমনভাবে

ই–ন্টা–রে–স্টি–ং শব্দটা উচ্চারণ করলেন শুনে, আমার পিত্তি জ্বলে গেলো। এই ধরনের বিলেত আমেরিকা–ফেরত ভদ্রলোকেরা নাসিক্যধ্বনিতে এমনভাবে বাংলা উচ্চারণ করেন, শুনে আপনার মনে হবে তিনি বাংলা বলতে একেবারে অভ্যস্ত নন, যেহেতু ইংরিজি বললে আপনি বুঝবেন না, তাই দয়া করে আপনার সঙ্গে মাতৃজবানে কথা বলছেন। আমি মনেমনে ঠিক করে নিলাম, এই মুহূর্তে একটা ফয়সালা করে নেয়া উচিত, টেবিলে স্তূপীকৃত খাদ্যবস্তু গলাধঃকরণ হওয়ার পরে স্যার অবশ্যই আমাকে অনুবাদ পাঠ করে শোনাবার নির্দেশ দেবেন। যে ভঙ্গিতে ডক্টর সাহেব ইন্টারেস্টিং শব্দটা উচ্চারণ করলেন, সেরকম প্রশংসাবাক্য যদি আমাকে হাজেরান মজলিশের কাছ থেকেও শুনতে হয়, সেসব গুরুপাচ্য জিনিস আমার পক্ষে হজম করা সহজসাধ্য হবে না। তাই ভাবলাম ভোজনপর্ব সমাধা হওয়ার পূর্বে এমন–কিছু করে ফেলা উচিত যাতে করে রচনাপাঠ আপনা থেকেই স্থগিত হয়ে যায়। আমি ড. মুশাররফকে জিগ্‌গেস করলাম, আপনি আমার দিকে একটু তাকান। তিনি আমার দিকে তাকালে আমি প্রশ্ন করলাম, আপনি জীবনে কবি গ্যোতে কিংবা তাঁর কাব্য ফাউস্টের নাম শুনেছেন?

ড. মুশাররফ ঘাড় চুলকে আমতা–আমতা করে বললেন, হাঁ শুনে থাকবো।

আমি বললাম, আর কিছু জানেন?

তিনি বললেন, মানে মানে কিছু–কিছু তো—

আমি তাঁর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বললাম, আপনি ইন্টারেস্টিং শব্দটা যেভাবে প্যাট্রোনাইজিং টোনে উচ্চারণ করলেন আমি নিশ্চিত যে এব্যাপারে আপনি কিছুই জানেন না।

আমাকে সেদিন আর রচনা পাঠ করতে হয়নি, সেকথা বলাই বাহুল্য। এখনও ড. মুশাররফের সঙ্গে দেখা হলে ভালোমন্দ জিগ্‌গেস করেন। আমার ধারণা সেদিনের সে ব্যাপারটি তাঁর পক্ষে ভুলে যাওয়া সম্ভব হয়নি। এখানে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন কাউকে সালাম দিলে, সালামটা তাঁর প্রাপ্য বলে ধরে নেন এবং যিনি সালাম দেন তাঁকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিতান্তই ছোটোলোক বলে ধরে নেয়া হয়।

অনেক কাঠখড় পোড়ানোর পর ফাউস্ট গ্রন্থটির অনুবাদ যখন শেষ করলাম, আমি সত্যি সত্যি মুশকিলে পড়ে গেলাম। যতোকাল কাজটা শেষ হয়নি মনে–মনে ধারণা পোষণ করে আসছিলাম মহান একটি বিদেশী কাব্য আমি বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের কাছে নিয়ে আসছি। অনেক জ্ঞানীগুণী মানুষ আমার অনুবাদের তারিফ করেছেন। স্বভাবতই আমার মনে একটা গর্ববোধ জন্ম

নিয়েছিল। রচনাটা যখন শেষ করলাম, দেখা গেল কোনো প্রকাশকই রচনাটিকে ছেপে বের করতে রাজি নন। যে-সকল প্রকাশক আমার যে-কোনো গদ্যরচনা এক সংস্করণের রয়্যালটির টাকা অগ্রিম শোধ করে প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হন না, তাঁরাও বললেন, এই বই বাজারে বিক্রি হবে তার কোনো সম্ভাবনা নেই। সুতরাং তাঁরা ছাপতে পারবেন না। এই অনুবাদকর্মটা সম্পন্ন করতে আমার বারো বছর লেগেছে। পাণ্ডুলিপির বোঝা হাতে করে প্রকাশকের ঘর থেকে ফিরে আসার সময়, আমার মনে হত বারো বছরের বিফল শ্রম আমার কাঁধে পর্বতের মতো ভারী হয়ে চেপে বসেছে।

যে-সকল বই প্রকাশকেরা সচরাচর ছাপেন না, সে-সকল মানসম্পন্ন রচনা বাংলা একাডেমী প্রকাশ করে থাকে। আমি বাংলা একাডেমীর শরণাপন্ন হলাম। একাডেমীর তৎকালীন আমলা মহাপরিচালক আমাকে যেভাবে পত্রপাঠ বিদায় করেছিলেন, সেই ঘটনাটি আমার মনে বিষাক্ত ক্ষতের মতো চিরদিন জেগে থাকবে। অথচ বাংলা একাডেমী আরেক ভদ্রলোককে শেকসপীয়রের একটি নাটক অনুবাদ করার জন্য সোয়া লক্ষ টাকা অগ্রিম প্রদান করেছিল।

স্যারের বাড়িতে যেতে আমি বিব্রত বোধ করতাম। তিনি প্রকাশক পাওয়া গেলো কি না সে সংবাদ জানতে চাইতেন। আমি জবাব দিতে পারতাম না। আমার হাতে তখন টাকাপয়সাও ছিল না। বেঁচে থাকা ভীষণ কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। আমার করুণ মলিন মুখ দেখে স্যার পাছে আমাকে করুণা করেন, সেই ভয়ে স্যারের বাড়িতে যাওয়া অনেক কমিয়ে দিয়েছিলাম। স্যার আমার মনোবেদনার কথা জানতেন। ফাউস্ট সম্পর্কে আর কোনো কিছু জিগ্‌গেস করতেন না। আমিও আর সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করতাম না।

একদিন স্যার আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি গেলে তিনি বললেন, কাইল আমি আলি আহসানের কাছে গেছিলাম। আপনের ফাউস্টের ব্যাপারে কথাবার্তা কইছি। আপনেও যদি সময় পান একবার যাইয়েন। আলি আহসান আমারে কথা দিছেন, হে জার্মান অ্যাম্বাস্যাডারের লগে কথাবার্তা কইয়া দেখব।

স্যারের কথামতো আমি একবার সৈয়দ আলি আহ্‌সান সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তখন তিনি জিয়াউর রহমান সাহেবের উপদেষ্টা। আমি কোনোদিনই সৈয়দ সাহেবের প্রীতিভাজন ছিলাম না। তবু আমি অবাক হলাম, এ কারণে যে তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে গ্রহণ করলেন। আর বললেন, রাজ্জাক স্যার বলেছেন তোমার ফাউস্টের অনুবাদটা খুব ভালো হয়েছে। আমি জার্মান অ্যাম্বাস্যাডারের সঙ্গে একটুখানি আলাপ করেছি। পরে আলাপ করে কী হল স্যারকে জানাবো।

দিন পনেরো পরে স্যার আমাকে আবার ডেকে পাঠালেন। আমি যখন স্যারের বাড়িতে গেলাম, দেখি স্যার বাইরে যাওয়ার জন্য তৈয়ার হচ্ছেন। আমাকে দেখে বললেন মৌলবি আহমদ ছফা আমি এক জায়গায় যাইবার লইছি, বেশি সময় অইব না। জার্মান অ্যাম্বাস্যাডারের লগে সৈয়দ আলি আহসান সাহেবের কথা অইছে। জার্মান অ্যাম্বাস্যাডার কইছেন, আপনের বই ছাপানোর সব খরচ অরা বিয়ার করব। আমি আলি আহসানরে একটা ভূমিকা লেইখ্যা দিবার কথা কইছি।

স্যারের কথা শুনে আমি ভীষণ উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম, কিন্তু যখন শুনলাম তিনি সৈয়দ আলি আহসানকে ভূমিকা লিখতে বলেছেন আমার মনটা বিশ্রী রকম খারাপ হয়ে গেলো। স্যারের ওপর আমার ভীষণ রাগ হল। আমি বারো বছর অমানুষিক পরিশ্রম করে অনুবাদকর্মটি সম্পন্ন করেছি। স্যার আমার মতামত না জেনে সৈয়দ আলি আহসান সাহেবকে ভূমিকা লেখার প্রস্তাব দিয়েছেন। এটা আমি কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারছিলাম না। সেদিন স্যারকে কিছু না বলে চলে এসেছি। ঘরে এসে ব্যাপারটা গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি। স্যার আমার ভালো চান, তাই আপনা থেকে উপযাচক হয়ে গিয়ে সৈয়দ আলি আহসান সাহেবের কাছে প্রস্তাব করেছেন, তাঁকে রাজি করিয়েছেন। এখন আমি যদি রাজি না হই স্যার মনেমনে চোট পেয়ে যাবেন। সে রাতে ঘুমোতে আমার অনেক কষ্ট হয়েছে। যে অনুবাদটি করতে আমি বারো বছর ব্যয় করেছি, সে বইটির জন্য অন্য কেউ আড়াই ঘণ্টায় আড়াই পৃষ্ঠার ভূমিকা লিখে দেবেন, সেটি কবুল করার চাইতে আমার ডানহাত কেটে ফেলা অনেক সহজ ছিলো। স্যারকে পরদিন গিয়ে জানিয়ে দিয়েছিলাম, আমি আরও কিছুদিন অপেক্ষা করবো, যদি বইটি অন্য কোনোভাবে প্রকাশ করা যায়। আমার আপত্তি কোথায় স্যার নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি হুঁকোর নলটা মুখে দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর ছোটো একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, আপনের উপকার করা অসম্ভব। আমাদের শ্রদ্ধাভাজন বয়োজ্যেষ্ঠরা যেভাবে আমাদের উপকার করতে চান আমরা পরবর্তী প্রজন্মের তরুণরা যেভাবে উপকৃত হতে চাই, তার মধ্যে বিস্তর ফারাক, সেদিন খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলাম।

পরবর্তীকালে আমার পক্ষে ফাউস্ট প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছিলো। এমনকি কোলকাতাতেও একটি এডিশন প্রকাশিত হয়েছিলো। জার্মান অ্যাম্বেসির অর্থানুকূল্যে ঢাকার এডিশনটি প্রকাশিত হয়েছিল। কলকাতার এডিশনটির ব্যয়ভার বহন করেছিলেন কোলকাতার জার্মান কনসাল জেনারেল।

স্যারের বিষয়ে লিখতে গিয়ে আমার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ যথাসম্ভব এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেছি। তথাপি ফাউস্টের বিষয়টি আমি বাদ দিতে পারলাম না।

এই নাতিক্ষুদ্র রচনাটিতে আমার পক্ষে যতোদূর সম্ভব প্রফেসর রাজ্জাকের মতামতসমূহ তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। উনি যেভাবে তাঁর কথা বলেছেন, আমি যেভাবে সেগুলো প্রকাশ করেছি এমন দাবি আমি করতে পারবো না—একটা ফারাক অবশ্যই থেকে গিয়েছে। সে ব্যাপারে অবশ্যই আমি সজাগ। স্মৃতি থেকে তুলে আনার সময় তাঁর মতামত এবং ব্যক্তি হিসেবে তাঁকে যথাযথ উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি। আমার যেটুকু সাধ্য আমি করেছি। এপর্যন্ত আমি রাজ্জাক স্যারের কথা বলেছি। তাঁর সম্পর্কে আমার আরও কিছু কথা আছে, সেগুলো পরবর্তীতে বলার চেষ্টা করছি।

পনেরো

স্যার সিঙ্গাপুর থেকে চোখের চিকিৎসা করে আসার পর বেশ কয়েকবার যাওয়া হল। তাঁর চোখেমুখে পানি নেমেছে। একটানা কথা বলতে গেলে হাঁপিয়ে ওঠেন। উঁচু চেয়ার থেকে ঝুঁকে টেবিলের ওপর বইপত্র পড়ার সময় তাঁকে একটি শিশুর মতো দেখায়। নানান কথা জিগ্‌গেস করে স্যারকে কষ্ট দিতে ভীষণ খারাপ লাগে। ইদানীং স্যারের মধ্যে নতুন প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। কথা বলা শুরু করলে থামতে চান না। একটানা কথা বলতে থাকেন। আগে কথা বলার সময় উইট ঠিকরে বেরিয়ে আসতো। হালে সে জিনিসটি বিশেষ লক্ষ করা যাচ্ছে না। স্যার তাঁর স্মৃতির ভাণ্ডে যতো কথা জমা হয়ে আছে সব উজাড় করে দিতে পারলেই যেনো বেঁচে যান। আগে স্যার হিসেব করে কথা বলতেন। কেউ আহত হচ্ছে কি না, সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে আগুপাছু নানারকম ভেবে তাঁর মতামত প্রকাশ করতেন। বর্তমান সময়ে তিনি তাঁর সঞ্চিত কথা নিঃশেষ করে ফেলার একটা নেশা যেনো তাঁকে পেয়ে বসেছে। বোধহয় তিনি উপলব্ধি করতে পারছেন তাঁর সময় দ্রুত শেষ হয়ে আসছে। তাই তিনি যাদেরকে নির্ভরযোগ্য এবং বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন, তাদের কাছে অভিজ্ঞতার কথা, উপলব্ধির কথা, চিন্তার কথা প্রকাশ করে স্বস্তি অনুভব করেন।

তবে একটা কথা—যাদেরকে তিনি নির্ভরযোগ্য মনে করেন না, তাদের কাছে কদাচিৎ মুখ খুলে থাকেন। খুব চাপাচাপি করা হলে মুখের ওপর বলে

বসতে তাঁর বাধে না, আমার শরীর ভালো নয়, কথাবার্তা বিশেষ কইবার পারুম না। তারপর তিনি একটা বই টেনে নিয়ে তাতে ডুবে যান। এই ধরনের পরিস্থিতিতে হাজার চেষ্টা করেও তাঁর মুখ থেকে একটা শব্দ বের করা অসম্ভব।

এক শুক্রবার বেলা এগারোটার দিকে আমি এবং ওবেইদ জায়গীরদার সাহেব স্যারের সামনে গেলাম। জায়গীরদার সাহেবের নাম বলায় স্যার চিনতে পারলেন। স্যার তাড়াতাড়ি বাঁধানো দাঁতগুলো মুখের ভেতর পুরে দিয়ে টিপে টুপে ঠিক করে মাড়িতে বসালেন। কথাটা শুরু হল রাজনীতিবিদদের জীবিকা নিয়ে। স্যার হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দির প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। তিনি বলতে থাকলেন—

শহীদ যাগো লগে চলাফেরা করতেন, যেমন ধরেন শরৎ বোস, সে সময়ে তাঁর ইয়ারলি ইনকাম আছিল পঁচিশ তিরিশ লাখ টাকার মতো। বিধান রায়ও মোটা আয় করতেন। সোহরাওয়ার্দির সেইরকম কোনো বাঁধাপড়া ইনকাম আছিল না, বাধ্য অইয়া তার চাঁদার টাকার ওপর ডিপেন্ড করতে অইত। বাংলাদেশ হওনের পর একবার আমাদের তাজুদ্দিন সাব কইলেন, এই দেশে আর পলিটিকস করুম না। আমি কইলাম পলিটিকস যে করবেন না বললেন, চলবেন কীভাবে? আপনের একটা ওকালতির সনদ আছে। আমার ত মনে অয় না, আপনে কোনোদিন কোর্টে গেছেন। এই কথা যদি কামাল হোসেন কইতেন তা অইলে একটা কথা আছিল। কামাল হোসেনের হাফ এ ডজেন অপশান আছে। ইচ্ছা করলে তিনি বিদেশে গিয়া প্র্যাকটিস করবার পারেন, য়্যুনিভার্সিটিতে পড়াইতে পারেন। কিন্তু আপনেরা মুখে কইলেও পলিটিকস ছাড়বার পারবেন না।

আমি প্রশ্ন করলাম, স্যার আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক দিন ছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার সঙ্গে এমন কারোর পরিচয় হয়েছিল কি না, যার স্মৃতি যতোদিন বেঁচে থাকবেন অনুরাগ সহকারে লালন করবেন?

স্যার বললেন, আমি মুনীরের নাম কমু।

আমি অধিকতর নিশ্চিত হওয়ার জন্য বললাম, আপনি কী মুনীর চৌধুরী সাহেবের কথা বলছেন?

স্যার বললেন, হ, মুনীরের মতো মানুষ আমি খুব কমই দেখছি। তার মধ্যে হিংসা বিদ্বেষের কোনো লেশ কোনোদিন দেখি নাই। অত্যন্ত উচ্চ মানসিকতা সম্পন্ন মানুষ আছিল মুনীর।

আমি স্যারের চোখমুখের দিকে তাকালাম। তাঁর চোখের কোনায় পানি চিকচিক করছে। কিছুক্ষণ কথা কলতে পারলেন না। একটু থেমে আবার শুরু করলেন।

একসময় আমি আর মুনীর দুইজনে আজিমপুরে দুটি য়্যুনিভার্সিটির ফ্লাটে কাছাকছি থাকতাম। একদিন বেয়ানবেলা বাজার থিকা ফিরার পথে আমার ফ্লাটে আইস্যা চুপ কইর‍্যা বসল। অনেকক্ষণ কথা কয় না। আমি জিগাইলাম কী অইছে? অনেকক্ষণ চুপ কইরা থাকনের পর কইল গত রাইতে লিলি (বেগম মুনীর চৌধুরী) আমারে কইল তুমি যদি রাজ্জাক স্যারের মতো অইবার চাও তোমার বিয়া করন ঠিক অয় নাই।

স্যার বললেন, আমি কইলাম ঠিকই ত কইছে। সকালে তোমার আমার এইহানে আসার কী দরকার? এমনি ত প্রতিদিন য়্যুনিভার্সিটিতে দেখা অয়।

স্যার স্মৃতি হাতড়ে মুনীর চৌধুরীর বিষয়ে বলছিলেন, লিবারেশন ওয়ারের সময়ে একদিন আমার ভাইস্তা আবুল খায়ের মুনীরের লগে দেখা করবার গেছিল। মুনীর অনেক মানুষের লগে কথা কইতে আছিল। আবুল খায়েররে দেইখ্যা কইল তুমি অপেক্ষা করো। সকলে যখন চইল্যা গেল মুনীর আবুল খায়েররে জিগাইল কেমন আছ। আবুল খায়ের হেসে জবাব দিল ভালা। মুনীর কইল আইচ্ছা যাও। মুনীরের সেন্স আছিল ভয়ঙ্কর কীন। কোথায় আছে, কীভাবে আছে যদি জাইন্যা লইত, আর্মির টর্চারের মুখে বইল্যা দেঅন অসম্ভব না। এই কথা চিন্তা কইর‍্যা মুনীর তার কাছেই আর কিছুই জিগায় নাই।

মুনীর অ্যান্ড মোরতাজা দে ডায়েড ফর প্রিন্সিপল। ইচ্ছা করলেই তারা বাঁচতে পারত।

আমি অধিকতর স্পষ্ট হওয়ার জন্য জানতে চাইলাম, স্যার, আপনি কি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার মোরতাজার কথা বলছেন?

স্যার বললেন, হ, মোরতাজা উচ্চশ্রেণীর চরিত্রের অধিকারী আছিল। হে তার বউরে কইয়া রাখছিল, আমি যদি কোনো বিপদে পড়ি, তুমি সোজা স্যারের কাছে চইল্যা যাইবা। তার পর স্যার মুক্তিযুদ্ধের সময়ের আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করলেন। আমার অ্যাকাউন্ট আছিল ইস্টার্ন ব্যাংকে। য়্যুনিভার্সিটি থেইক্যা মাইনার চেকটা নিয়া আমি মাখনের কাছে দিলাম। মাখন টাকাটা তুইল্যা আমার হাতে দিল।

আমি নিশ্চিত হওয়ার জন্য জানতে চাইলাম, স্যার, আপনি কি তৎকালীন ছাত্রলীগের নেতা আবদুল কুদ্দুস মাখনের কথা বলছেন?

স্যার বললেন, না না! নূরুল আমিন সাহেবের ছেলে রাজিয়া খানের স্বামী আনোয়ারুল আমিনের কথা কইতাছি। প্রতি মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের চেকটা তার কছে যাইত। কীরকম রিসক ঘাড়ে লইছিল চিন্তা কইর‍্যা দেখেন। সবকিছু কাগজপত্রে রেকর্ডেড। জানবার পারলেই নির্ঘাত মৃত্যু।

রাজ্জাক স্যার খায়রুল কবিরের প্রসঙ্গ টেনে আনলেন। তিনি সাংবাদিক হিসেবে জীবন শুরু করেছিলেন। পরে ব্যাংকের চাকুরিতে যোগ দিয়েছিলেন।

স্যার তাঁর সম্পর্কে এভাবে বলতে আরম্ভ করলেন, আপনেরা খায়রুল কবির সাব'রে সর্বাংশে ভালো মানুষ কইবেন না। তাঁর চরিত্রে এইদিক ওইদিক অনেক আছে। কিন্তু তাঁর কাছে আমি না শুধু, আমার পরিবারের বেবাক মানুষ অত্যন্ত ঋণী। সে সময়ে আমার টাকার ক্রাইসিস। গ্রামে পালাইয়া বেড়াইতে আছি। এরই মাঝে একদিন খায়রুল কবির খোঁজখবর লইয়া আমার কাছে লোক পাঠাইয়া জানাইলেন আপনের টাকার প্রয়োজন আছে জানি, তার জন্য আপনে কোনো চিন্তা কইরেন না। মাসে-মাসে টাকা আপনার কাছে আমি পাঠাইয়া দিমু। যত কাল দেশ স্বাধীন অয় নাই, খায়রুল কবির সাব তাঁর কথা রাখছেন।

আমি কথা প্রসঙ্গে জানালাম, আলাউদ্দিন খান সাহেবের ওপর একটি উপন্যাস লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। স্যার বললেন, আলাউদ্দিন খান একজন ঋষিতুল্য মানুষ আছিলেন। আপনে চেষ্টা করলে লিখতে পারবেন। আলাউদ্দিন খান সাহেব এমনিতে বিনয়ী মানুষ আছিলেন, কিন্তু একবার চটলে আর রক্ষা আছিল না। ক্ষীতিমোহন সেনের সঙ্গে খান সাহেবের একটা বিষয়ে মিল আছে। রাইগ্যা গেলে দুইজনই ভয়ানক অইয়া উঠতেন। রবীন্দ্রনাথ ক্ষীতিমোহনবাবুরে অনেক খোসামোদ কইর‍্যা শান্তিনিকেতনে রাখছিলেন। ক্ষীতিমোহনবাবু ছাড়া আর সকল মানুষরে রবীন্দ্রনাথ তুমি সম্বোধন করতেন। কিন্তু ক্ষীতিমোহনকে রবীন্দ্রনাথ আপনি সম্বোধন করতেন। ক্ষীতিমোহনবাবুও রাইগ্যা গেলে প্রচণ্ড অইয়া উঠতেন। আশু সেন আছিলেন ক্ষীতিমোহনবাবুর জামাই। যখন জানতে পারলেন, আগে আশুবাবু আরেকটা মেমসাহেব বিয়া করছিলেন, ক্ষীতিমোহনবাবু জামাইরে খুন করবার লইছিল। কিছুদিন আগে দেশ পত্রিকা ক্ষীতিমোহন সেনের চিঠিপত্র ছাপাইছে দেখছেন নিহি? পড়লে বুঝতে পারবেন মানুষটা কেমন আছিল।

আমি বললাম, ক্ষীতিমোহন সেনের 'কবীর', 'চিন্ময়বঙ্গ', 'ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমানের যুক্ত সাধনা' এসব বই আমি পড়েছি।

স্যার বললেন, বই পড়ে ক্ষীতিমোহন সেনের সবটা জানা যাইব না। চিঠিপত্রের মধ্যেই মানুষটার আসল পরিচয় পাওন যায় বেশি। স্যার বলতে থাকলেন, আমি যত অসাম্প্রদায়িক মানুষ দেখছি ক্ষিতিমোহনবাবু এবং তাঁর জামাই আশুবাবুর মতো আর কাউরে দেখি নাই। আশু সেন আছিলেন হাইকোর্টের জজ। পরে ঢাকা য়্যুনিভার্সিটির ট্রেজারার অইছিলেন। এখন যে

নোবেল প্রাইজ ধরি-ধরি করতাছেন অমর্ত্য সেন, আশু সেন আছিলেন তাঁর বাবা। অমর্ত্য অইল গিয়া ক্ষীতিমোহন সেনের নাতি। বিক্রমপুরের খাঁটি বাঙাল।)

রাজ্জাক স্যার অত্যন্ত তাজিম সহকারে কাজী মোতাহার হোসেনের কথা স্মরণ করলেন। লেকচারার হিসেবে মাইনা পাইতেন একশো বিশ টাকা। রিডার হিসেবে রিটায়ার করার সময়ও কত পাইতেন, তিনশো টাকার বেশি না। এ নিয়া তারে কেউ কোনোদিন কথা বলতে শুনে নাই। ইংরেজি বাংলা দুইডা ভাষাতে সুন্দরভাবে পড়াইবার পারতেন। হরিদাস ভট্টাচার্য ফিলসফির মাস্টার আছিলেন। অগাধ পাণ্ডিত্য। তাঁরও টাকাপয়সার দিকে নজর আছিল না। মাঝে মাঝে হুমায়ূন কবির ভাইভা নিতে আইলে তাঁর বাড়িতে থাকতেন। হরিদাসবাবুরে জর্জ দ্যা ফিফথ লেকচার দিবার জন্য ডাকা অইল। তাঁর আগে এই লেকচার দিছিলেন অলডাস হাক্সলি। এ্যালডাস হাসকলির কথা সকলে কয়, হরিদাস বাবুরে মনে রাখছে কয় জন।

আমি ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর কথা ওঠালাম।

রাজ্জাক স্যার বললেন; শহীদুল্লাহ সাহেব যে বিষয়ে পিএইচডি করছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ইংরেজ ভাইস চ্যান্সেলর মনে করতেন, শহীদুল্লাহ সাহেবের সে বিষয়ে কাজ করার যোগ্যতা আছিল না।

আমি ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর অন্যবিধ কীর্তির প্রতি স্যারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করলাম, দেখলাম তিনি সে বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী নন।

আমরা ওঠবার চেষ্টা করছিলাম। স্যার অনেক কথা বলে ফেলেছেন। এরই মধ্যে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। টের পাচ্ছিলাম, কথা বলতে তাঁর হাফ ধরে যাচ্ছে। আমাদের খারাপ লাগছিল। আমরা তাঁকে কষ্ট দিচ্ছি। কিন্তু শেষ মুহূর্তে স্যার আবার মুনীর চৌধুরীর কথা ওঠালেন।

ষোলো

ইংরেজ কবি শেকস্‌পীয়র বলতে গেলে বেবাক জীবনটা লন্ডনে কাটিয়েছিলেন। তবু তাঁকে অ্যাবন নদীর পাড়ের ছাওয়াল বলতে অনেকে কুণ্ঠাবোধ করেননি।

জার্মান কবি গ্যোতে তিরিশের কোঠায় পা রাখার সময়ে জন্মভূমি ফ্রাঙ্কফুর্ট ছেড়ে ভাইমারে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর বিরাশি বছরের দীর্ঘজীবনের সবটাই ভাইমারে কেটেছে। তথাপি তাঁকে মাইন তীরবর্তী ফ্রাঙ্কফুর্টের ছাওয়াল বলা হয়।

প্রফেসর আবদুর রাজ্জাককে যদি একটামাত্র পরিচয়ে শনাক্ত করতে হয়, আমার ধারণা 'ঢাকার পোলা' এর চাইতে অন্য কোনো বিশেষণ তাঁর সম্পর্কে প্রযোজ্য হতে পারে না। তিনি ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ থানায় জন্মগ্রহণ করেছেন। সেটাই তাঁকে ঢাকার পোলা বলার একমাত্র কারণ নয়। ঢাকার যা-কিছু উজ্জ্বল গৌরবের অনেক কিছুই প্রফেসর রাজ্জাকের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে। তিনি সবসময়ে ঢাকাইয়া ভাষায় কথা বলেন। ঢাকাইয়া বুলিতে যে একজন সুশিক্ষিত সুরুচিসম্পন্ন ভদ্রলোক মনের গহন ভাব অনুভাব বিভাব প্রকাশ করতে পারেন এবং সে প্রকাশ কতটা মৌলিক গুণসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে, রাজ্জাক সাহেবের মুখের কথা যিনি শোনেননি, কোনোদিন বুঝতে পারবেন না। ঢাকার পুরোনো দিনের খাবারদাবার রান্নাবান্না যেগুলো হারিয়ে গেছে অথবা হারিয়ে যাওয়ার পথে প্রফেসর রাজ্জাক তার অনেকগুলোই ধরে রেখেছেন। তাঁর বাড়িতে এখনও প্রায় প্রতিদিনই কমপক্ষে একটা দুটো পদ ঢাকার খাবার রান্না করা হয়। খাওয়াদাওয়া, রান্নাবান্না, আচার-অচরণের ঢাকাইয়া বৈশিষ্ট্যগুলো প্রফেসর রাজ্জাক এবং তাঁর পরিবার অতি সযত্নে রক্ষা করে আসছেন। নানা দেশের খাবার এবং রান্নাবান্নার প্রতি প্রফেসর রাজ্জাকের বিলক্ষণ অনুরাগ আছে। তাঁর বাড়িতে বিদেশী খাবার রান্না হয় না এমন নয়। যখনই তিনি দেশের বাইরে গিয়েছেন, কমপক্ষে একপদ হলেও রান্না শিখে এসেছেন। ল্যাবরেটরিতে যেভাবে কেমিক্যাল কম্পাউন্ড পরীক্ষা করা হয়, সেরকম নিক্তিমাপা সতর্কতা সহকারে নতুন ভিনদেশী খাবার রান্না করা হয়। তাঁর পরিবারের মহিলারা বিদেশী খাবার পরীক্ষানিরীক্ষায় একরকম পারদর্শিতা অর্জনও করে ফেলেছেন। কিন্তু দেশীয় খাবার, বিশেষ করে পুরোনো দিনের খাবারের মর্যাদার জায়গাটি ভিনদেশী খাবার কখনো অধিকার করতে পারেনি। ঢাকার পুরোনো দিনের খাবারদাবারের প্রতি তাঁর যে মমত্ববোধ, সেটা আমার কখনো অন্ধ ঐতিহ্যপ্রীতি মনে হয়নি। ঢাকার খাবারের কদর তিনি করেন, কারণ ওগুলো যথার্থই ভালো। উৎকর্ষের দিক দিয়ে পৃথিবীর অন্য যে-কোনো দেশের খাবারের সমকক্ষ।

ঢাকার খাবার এবং ঢাকার বুলি নয় শুধু, তাঁর চরিত্রের আঁশে শাঁষে আরও এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য আছে যে-কেউ রাজ্জাক সাহেবের সংস্পর্শে এসেছেন, নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন, এই মানুষের জন্ম ঢাকা ছাড়া অন্য কোথাও সম্ভব ছিল না। তাঁর মুখের ভাষা, খাবার এবং পোশাকআশাক সবকিছুর

মধ্যে এমন কতিপয় স্থানীয় বৈশিষ্ট্য মূর্ত হয়ে ওঠে, অন্য যে-কোনো মানুষের বেলায় সেটা বাড়াবাড়ি মনে হত। রাজ্জাক সাহেবের বেলায় সেটা মোটেই মনে হয় না এবং এটাই আশ্চর্যের। তিনি যখন বাজার করতে যেতেন, সব সময়ে লুঙ্গি-পাঞ্জাবি পরতেন। কখনো গলায় চাদর থাকত, কখনো থাকত না। ইদানীং চলাফেরা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে, শরীরে কুলোয় না। বাড়িতে যতোক্ষণ থাকেন গলার দুপাশে একটা গামছা পেঁচিয়ে রাখেন। প্রথম দৃষ্টিতেই তাঁকে একজন মাঠের কৃষক ছাড়া কিছুই মনে হওয়ার কথা নয়।

এই রচনার নানা অংশে তাঁর জ্ঞানবিদ্যার কিছু পরিচয় তুলে ধরতে চেষ্টা করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিতদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, বিলেত আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তাঁর কীরূপ সমাদর সেসব বিষয়েও কিছু কথাবার্তা প্রসঙ্গক্রমে বলা হয়েছে। প্রফেসর রাজ্জাকের চরিত্রের প্রণিধানযোগ্য বৈশিষ্ট্যটি আমি সবসময়ে সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে লক্ষ করে আসছি, সেটি হল তাঁর নিজের দেশ, সমাজের প্রতি নিঃশর্ত অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারবোধই প্রফেসর রাজ্জাককে অন্য সকলের চাইতে আলাদা করেছে। ইংরিজিতে যাকে ইনটিগ্রিটি বলা হয়, বাংলায় আমি এ মুহূর্তে তার কোনো সঠিক প্রতিশব্দ খুঁজে পাচ্ছিনে। সবদিক মিলিয়ে এক ধাতুতে তৈরি করা ওঁকের মতো ইনটিগ্রিটিসম্পন্ন মানুষ বাঙালি মুসলমানসমাজে একজনও দেখিনি। হিন্দুসমাজে সন্ধান করলে হয়তো কতিপয় পাওয়া যেতে পারে।

প্রফেসর রাজ্জাক বাঙালি মুসলমানের দৃষ্টি দিয়ে পৃথিবীকে দেখেছেন এবং বিচার করেছেন। আবার পৃথিবী-দেখা চোখ দিয়ে বাঙালি মুসলমানসমাজকে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। নিজস্ব সামাজিক অবস্থানের ওপর দাঁড়িয়ে এবং নিজের সামাজিক পরিচিতির আদি বৈশিষ্ট্যসমূহ গৌরবের সঙ্গে ধারণ করে একটা বিশ্বদৃষ্টির অধিকারী হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। বাঙালি মুসলমানসমাজকে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সাবালক করার পেছনে তাঁর যে ভূমিকা তার সঙ্গে কারও তুলনা হতে পারে না। এখানে একটা কথা পরিষ্কার করে নেয়ার প্রয়োজন আছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক যে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন হয়েছিল, মুসলিম সমাজে মুক্ত চিন্তার চর্চার ক্ষেত্রে একটা বড় ভূমিকা পালন করেছিল, সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই আন্দোলনের কুশীলবদের অনেকেই রাজ্জাক সাহেবের চাইতে বয়সে বড় ছিলেন। কাজী মোতাহের হোসেন ছিলেন ওই আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিবৃন্দের একজন। রাজ্জাক সাহেব কাজী সাহেবের গুণমুগ্ধ এবং স্নেহভাজন ছিলেন। তথাপি ওই আন্দোলনের মর্মবেগ যে তাঁকে স্পর্শ করেছিল এমন মনে হয় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু মধ্যবিত্তসমাজের লোকেরা পাশ্চাত্য সভ্যতার

সংস্পর্শে এসে ধর্ম এবং সামাজিক সংগঠনের মধ্যে যে ধরনের সংস্কার আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক মুসলিম সাহিত্যসমাজের তরুণেরা ব্রাহ্মসমাজের আদলে বাঙালি মুসলমান সমাজের চিন্তাভাবনা রূপায়িত করার চেষ্টা করতেন। অন্তত ব্রাহ্মসমাজের জলছবিটা তাঁদের অনেকেরই মনে ক্রিয়াশীল ছিল। সেই জিনিসটি রাজ্জাক সাহেবকে টানেনি। রাজ্জাক সাহেব ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু মধ্যবিত্তের জাগরণ হিন্দুসমাজের ওপরতলার জনগোষ্ঠীর একটা অংশে যে-সকল রূপান্তর বয়ে এনেছিল, বাংলাভাষা এবং সাহিত্যের বিকাশ ছাড়া তার অনেক কিছুই মুসলমানসমাজের জন্য ইতিবাচক এবং অনুকরণযোগ্য, তিনি একথা মনে করতে পারেননি। হিন্দুসমাজ থেকে উদ্ভূত চিন্তাভাবনা হিন্দুসমাজকে ঘিরেই আবর্তিত হত। সেই সঙ্কীর্ণ বলয় সম্প্রসারিত হয়ে কখনো মুসলমানসমাজকেও কোল দেবে সে যুগের অন্যান্য মুসলিম কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের মতো রাজ্জাক সাহেবও বিশ্বাস করতে পারেননি।

প্রফেসর আবদুর রাজ্জাক পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছিলেন। তিনি কী কারণে পাকিস্তান দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন, তার একটা কৈফিয়ত তিনি দিয়েছেন। এটা গ্রহণযোগ্য কৈফিয়ত কি না বিচারের ভার অন্যদের। ভারতবর্ষকে খণ্ডিত না করে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানের হয়তো পন্থা ছিল, কিন্তু সেটা কেউ অনুসরণ করেনি। যদি আর কিন্তু দিয়ে ইতিহাস হয় না। যা ঘটে গেছে তাইই ইতিহাস। এই অঞ্চলে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, মুসলিম লীগ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবি উত্থাপন করেছিল। রাজ্জাক সাহেব মুসলিম লীগের সক্রিয় সদস্য ছিলেন এবং পাকিস্তান দাবির সমর্থক ছিলেন। সেই পরিবেশ পরিস্থিতিতে তিনি মনে করেছিলেন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলেই বাংলার মুসলমান সমাজের উপকার হবে। বাংলাদেশকে-পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার ধারণাটিও রাজ্জাক সাহেবের মস্তক থেকে এসেছিল। ভারত ভেঙে পাকিস্তান হয়েছে। এক-জাতিতত্ত্বের বদলে দ্বি-জাতিতত্ত্বের বিজয় সূচিত হয়েছে। পাকিস্তান ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে দ্বি-জাতিতত্ত্বের মৃত্যু ঘটলো, কিন্তু এই ঘটনা এক-জাতিতত্ত্ব সত্য প্রমাণিত হওয়ার স্বীকৃতি, নাকি ভারতবর্ষে বহু-জাতীয়তার উদ্বোধন, সেই বিষয়টি এখনও সুস্পষ্ট আকার লাভ করেনি। এই ঐতিহাসিক পরিবর্তন রূপান্তরের মধ্যে রাজ্জাক সাহেব যে অবস্থানটি গ্রহণ করেছিলেন, তা সঠিক কি বেঠিক ছিল সে বিতর্কেও আমি প্রবৃত্ত হবো না। আমি শুধু একটি কথাই জোর দিয়ে বলবো, রাজ্জাক সাহেব মনেপ্রাণে একজন খাঁটি সেক্যুলার মানুষ। কিন্তু বাঙালি মুসলমানসমাজের সেক্যুলারিজমের বিকাশের প্রক্রিয়াটি

সমাজের ভেতর থেকে, বাঙালি মুসলমানের সামাজিক অভিজ্ঞতার স্তর থেকে বিকশিত করে তুলতে হবে, একথা তিনি মনে করেন।

রাজ্জাক সাহেব একটা বিশেষ যুগ, বিশেষ সময়ের মানুষ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় দশকের দিকে রাজ্জাক সাহেব ছিলেন ছাত্র এবং তৃতীয় দশকে শিক্ষক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। এই রচনায় অন্তত এক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে যে এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তার একটি পাকিস্তান আন্দোলন, অন্যটি ভাষা আন্দোলন এবং পরেরটি বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম। রাজ্জাক সাহেবের জীবন ওই তিনটি ঘটনার মধ্য দিয়েই প্রবাহিত হয়েছে। এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক অহংবোধ এই তিনটি ঘটনায় তিনবার তিনভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। একটার সঙ্গে আরেকটার বহিরঙ্গের দিক দিয়ে পার্থক্য থাকলেও একটা মূলগত ঐক্যের কথা কিছুতেই অস্বীকার করার উপায় নেই। রাজ্জাক সাহেবকে বাঙালি মুসলমানসমাজের ঐতিহাসিক অহংবোধের প্রতীক বললে অধিক হবে না। তথাপি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সনাতন মুসলিম লীগপন্থীদের সঙ্গে পুরোপুরি এক না হলেও সর্বাংশে উদার একথা মানতে অন্তত আমার বাধবে। উনিশশো তিরিশ সালের পর যে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীটি বাংলার মুসলমানের আশা–আকাঙ্ক্ষার ধারক বাহক হয়ে উঠেছিল, রাজ্জাক সাহেব ছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচাইতে শানিতদের মধ্যে বিশিষ্ট একজন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর যে–সমস্ত বুদ্ধিজীবী বাংলাদেশের জন্ম–প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, রাজ্জাক সাহেব তাতে একটি অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর চরিত্রের একরৈখিকতা, অনাপোসি মনোভঙ্গি এবং একান্ত মুসলিমসমাজভিত্তিক ধ্যান–ধারণার মধ্যে একটা প্রবণতা অনায়াসে লক্ষ করা যাবে, সেগুলো যতোটা নিরপেক্ষ ইতিহাস অনুধ্যানের ফল ততটা হিন্দুসমাজের প্রতিক্রিয়াসঞ্জাত অভিব্যক্তি। যে সময়ে, যে সমাজে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন, যে সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে তিনি বেড়ে উঠেছেন, তার প্রভাব পুরোপুরি অতিক্রম করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তথাপি ভাবতে অবাক লাগে তিনি যে প্রজন্মের মানুষ, সেই প্রজন্মকে কতদূর পেছনে ফেলে এসেছেন। পরবর্তী অনেকগুলো প্রজন্মকে বুদ্ধিবৃত্তি এবং মানসকর্ষণের দীক্ষা দিয়েছেন। বলতে গেলে কিছুই না লিখে শুধুমাত্র সাহচর্য, সংস্পর্শের মাধ্যমে কত কত আকর্ষিত তরুণচিত্তের মধ্যে প্রশ্নশীলতার অঙ্কুর জাগিয়ে তুলেছেন, একথা যখন ভাবি বিস্ময়ে অভিভূত না হয়ে উপায় থাকে না।